ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আবুল কালাম আযাদ আনোয়ার

ও

আখতারুজ্জামান মুহাম্মদ সুলাইমান

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1435

IslamHouse.com

الآداب والثقافة الإسلامية

« باللغة البنغالية »

أبو الكلام آزاد أنوار

و

أختر الزمان محمد سليمان

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2014 - 1435

IslamHouse.com

সূচিপত্র

মুসলিমের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন একটি মূল থেকে। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣ ﴾ [الحجرات: ١٣]

'হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মাঝে যে অধিক মুত্তাকী সে-ই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন এবং সবকিছুর খবর রাখেন।'[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ে ঘোষণা করে বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ তা'আলা জাহেলী অহমিকা ও বাপ-দাদার বড়াই মিটিয়ে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম সন্তান, আর আদম মাটির সৃষ্টি।

---

১ হুজুরাত, ১৩

আল্লাহ তা‘আলা মানুষ সৃষ্টি করে তাঁকে চেনার মত যোগ্যতা দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি রব ও উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যেগুলো মানুষের বিবেক, অনুভূতি ও আত্মাকে সম্বোধন করে। মানুষকে তাঁর পরিচয় লাভ না করার কারণে শাস্তি প্রদানের জন্যে এতটুকুর উপরই ক্ষান্ত হননি; বরং রাসূল প্রেরণ করে কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে মানব প্রকৃতিকে সম্বোধন করে সঠিক ধারণার বীজ বপন করা যায়। এ বিষয়ে প্রচুর আয়াত রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًاۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَاۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ ۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ ﴾ [الروم: ٣٠، ٣١]

“তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর (প্রদত্ত) প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটা সহজ-সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। বিশুদ্ধচিত্তে তার অভিমুখী হয়ে তাঁরই তাকওয়া অবলম্বন কর, তোমরা সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।”[২]

---

২ সূর আর -রূম : ৩০-৩১

আল্লাহ তা‘আলা মানুষের নিকট এরকমই চেয়েছেন। কিন্তু মানুষ সংকীর্ণ বিবেক ও কুপ্রবৃত্তির কারণে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করে, বিভ্রান্ত হয়ে নানা পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে আকল-বুদ্ধি-বিবেক ও আত্মা দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এক দিককে অপরটির উপর প্রাধান্য দেবে, সে সঠিক রাস্তা থেকে সরে যাবে।

ইসলামী ব্যক্তিত্বের গুণ-বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমের জন্য এমন কিছু গুণাবলী নির্ধারণ করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে তাদের সহজেই অন্যদের থেকে পৃথক করা যায়।

(১) মুসলিম আকীদা ও বিশ্বাসে দৃঢ় :—

মুসলিম আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসেবে দৃঢ়বিশ্বাস করে। আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাব, রাসূলগণ, আখেরাত ও ভাল-মন্দ তাকদীরের উপর ঈমান রাখে।

ঈমানের ভিত্তির উপর একজন মুসলিম জীবনকে পরিচালিত করে, যা তাকে আচার-ব্যবহার, চলাফেরা, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও লেনদেনে

দিক নির্দেশনা দেবে। এর উপরই প্রতিষ্ঠিত হবে তার জীবন-জীবিকা ও সময়। নির্ধারিত হবে তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার কাজকর্ম চলবে সুস্পষ্ট প্রামাণ্যতার উপর, যাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও চিন্তা-বিভ্রান্তি থাকবে না।

ইসলাম এ বিষয়টির উপরই বিশেষ জোর দিয়েছে ; কেননা এ জীবনে মানুষের চলার সূচনা কি হবে সেটা একমাত্র ইসলামই নির্ধারণ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ﴾ [محمد: ١٩]

'সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (প্রকৃত) কোনো মাবুদ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্যে।'[৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন—

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]

---

৩ মুহাম্মদ : ১৯

‘রাসূল ঈমান রাখেন ঐ সব বিষয়ে যা তার রবের পক্ষ থেকে তার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমরাও। সবাই ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তার রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে: আমরা তাঁর রাসূলগণের মাঝে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে : আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি, আমরা তোমার ক্ষমা চাই হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।’[৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٣٦ ﴾ [النحل: ٣٦]

‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মাঝে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে

---

৪ বাকারা : ২৮৫

গেছে।সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।’[৫]

(২) মুসলিম ইবাদতে দৃঢ় :-

আল্লাহর ইবাদত করাই হল মুসলিমের জীবন, তাদের কাজকর্ম চলবে নীতিবদ্ধতা, শৃঙ্খলা, ভারসাম্যের উপর। সে এ ধরনের ইবাদতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, যাতে জীবনের সকল দিক অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

‘আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি’।[৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

---

৫ নাহল : ৩৬

৬ যারিয়াত : ৫৬

‘হে নবী! আপনি বলুন : আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন-মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তার কোনো অংশীদার নেই। আমি তা-ই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্য পোষণকারী।’[৭]

তার উপর ভিত্তি করেই মুসলিম একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]

‘তাদেরকে এ ছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।’[৮]

আর তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণও থাকতে হবে। যেমন হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد».

যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমার কোনো নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।[৯]

---

৭ আনআম : ১৬২- ১৬৩।

৮ বাইয়্যেনাহ : ৫।

(৩) মুমিন উত্তম চরিত্রের অধিকারী :—

একজন মুসলিমের ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো উত্তম আখলাক ও সুন্দর ব্যবহার। আর এ ক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরণ করবে প্রথম আদর্শ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর, যার প্রশংসা করেছেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ বলেন—

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤ ﴾ [القلم: ٤]

'নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।'[১০]

আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—

«كان خلقه القرآن».

'কুরআনই ছিল তার চরিত্র।'[১১]

তিনি সর্বদাই উম্মতকে উত্তম চরিত্র গ্রহণ করার আদেশ দিতেন। তিনি বলেন—

---

৯ মুসলিম : ৩২৪৩

১০ কলম : ৪

১১ মুসনাদে আহমদ : ২৩৪৬০

«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً».

'সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি যে সবচেয়ে চরিত্রবান।'[১২]

জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট অসিয়ত তলব করলে তিনি বলেন—

«اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن».

'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর। গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে একটি নেক আমল করে ফেল, তা সেটি মিটিয়ে দিবে। আর মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কর।'[১৩]

ইসলাম ইবাদতের সাথে আখলাককে মিলিয়ে দিয়েছে। একজন প্রকৃত আবেদ ইবাদতের মাধ্যমে তার চরিত্র সংশোধন করে নিবে। আল্লাহ বলেন—

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ﴾ [العنكبوت: ٤٥]

'নিশ্চয় সালাত অন্যায় ও অশালীন কাজ থেকে (আদায়কারীকে) বিরত রাখে।'[১৪]

---

১২ তিরমিযী : ১০৮২

১৩ তিরমিযী : ১৯১০

১৪ আনকাবুত : ৪৫

সিয়াম সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أوشاتمه فليقل إني صائم».

'তোমরা সিয়াম পালনের দিনগুলোতে অশালীন কাজ ও শোরগোল কর না। যদি কেউ গালি দেয় অথবা ঝগড়া করে, তাহলে বলবে—আমি রোজাদার।'[১৫]

হজের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]

'তবে সে হজের মাঝে সহবাস, দুষ্কর্ম ও কলহ করতে পারবে না।'[১৬]

'এমনিভাবে উত্তম আখলাকের গুরুত্ব সম্পর্কে শরীয়তের অনেক দলীল প্রমাণ রয়েছে। একজন প্রকৃত মুমিন উত্তম চরিত্র ও প্রশংসিত গুণাবলির অধিকারী হবে—এটি স্বাভাবিক। উত্তম গুণসমূহ যেমন—সততা, বদান্যতা, বিনম্র আচরণ, খারাপ বস্তু থেকে দৃষ্টি সংরক্ষণ, অশালীন কাজ থেকে দূরে থাকা, ধৈর্য, লজ্জা—প্রভৃতি।'

---

১৫ বুখারী : ১৭৮১

১৬ বাকারাহ্ : ১৯৭

(৪) মুসলিম ইলম ও প্রজ্ঞার উপর জীবন অতিবাহিত করে :—

সে অন্যদের সাথে এমন ব্যবহার করে, যেমন ব্যবহার অন্যদের থেকে আশা করে। অন্যদের ভালোবাসে এবং তাদের কল্যাণ কামনা করে। তাদের জন্যে দো'আ করে এবং আহ্বান করে এমন কাজের প্রতি যা তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বয়ে আনে।

মুসলিম এমন স্বার্থপর হবে না যে, শুধু নিজের কল্যাণ কামনা করে, অন্যের নেয়ামত কুক্ষিগত করার আশা করে। কখনও সে অন্যের অমঙ্গল চাইতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার দাওয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই একজন প্রকৃত মুসলিম মানুষকে হেদায়েত ও দিক-নির্দেশনা দেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ ﴾ [ال عمران: ١١٠]

'তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্যে বের করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবে।

এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। আর আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।'[১৭]

আল্লাহ তা'আলা কাজের উৎসাহ প্রদান লক্ষ্যে বলেন—

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۝٣٣ ﴾ [فصلت: ٣٣]

'ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং নিজেও নেক আমল করে, আর বলে আমি মুসলিমদের একজন।'[১৮]

মুসলিম গুণে বিশিষ্ট হওয়ার ফল:—

(১) মানসিক শান্তি:

অন্তরের প্রশান্তি ও অস্থিরতার ফলেই পার্থিব জীবনে প্রতিটি মানুষ সুখ-দুঃখের সম্মুখীন হয়। মুসলিম সর্বাবস্থায় মানসিক শান্তিতে

---

১৭ আলে ইমরান : ১১০

১৮ ফুসসিলাত : ৩৩

থাকে, সতত নিজেকে আবিস্কার করে এক অনাবিল স্থিরতা ও প্রশান্তিতে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ٢٨ ﴾ [الرعد: ٢٨]

'যারা মুমিন এবং যাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। শোন! আল্লাহর জিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে থাকে।'[১৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন—

﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٖ مِّن رَّبِّهِۦۚ فَوَيۡلٞ لِّلۡقَٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ٢٢ ﴾ [الزمر: ٢٢]

'যে ব্যক্তির অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং সে রবের পক্ষ থেকে নূরের উপর রয়েছে।

১৯ রা'দ : ২৮

(পক্ষান্তরে) যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে'[২০]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন—

﴿ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَـٰنًا مَّعَ إِيمَـٰنِهِمْ ۗ ﴾ [الفتح: ٤]

'তিনি এমন সত্তা যিনি মুমিনগণের অন্তরে বিশেষ শান্তি দিয়েছেন। যেন তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে যায়।'[২১]

(২) পৃথিবীতে আল্লাহর দাসত্বের বাস্তবায়ন :—

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের লক্ষ্যে।'[২২] তিনি আরো বলেন—

---

২০ যুমার : ২২

২১ ফাতহ : ৪

২২ যারিয়াত : ৫৬

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ۝١٦٣ ﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

'আপনি বলুন : আমার সালাত, কুরবানি, জীবন, মরণ সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে। তার কোনো শরীক নেই। আমি এ মর্মেই আদিষ্ট হয়েছি আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।'[২৩]

(৩) স্থিতিশীলতা :

আল্লাহর পথে চলার মাধ্যমে নিরাপত্তা ও স্থিরতা অর্জিত হয়। এরই মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। আর বিপরীত পথে উল্টো ক্ষতি হয়।

(৪) সম্মান, সাহায্য ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ :

আল্লাহ বলেন—

﴿ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧]

'যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদসমূহ দৃঢ় রাখবেন।'[২৪]

---

২৩ আনআম : ১৬২-১৬৩

(৫) চূড়ান্ত লক্ষ্যের বাস্তবায়ন :

তা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও জান্নাতে প্রবেশ। আল্লাহ বলেন—

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ۝١٠٧ ﴾ [الكهف: ١٠٧]

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদের জন্য মেহমানদারিরূপে রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস।'[২৫]

---

২৪ মুহাম্মদ : ৭

২৫ কাহাফ : ১০৭

সত্যবাদিতা

বাস্তবতা অনুযায়ী সংবাদ দেওয়াকে বলা হয় সত্যবাদিতা। যার বিপরীত হয়েছে মিথ্যাবাদিতা। বাস্তবতার উল্টো সংবাদ দেওয়াই হচ্ছে মিথ্যাবাদিতা।

সত্যবাদিতার মর্যাদা :—

এটি একটি মহৎ গুণ। শরিয়ত যে সকল চারিত্রিক দিকের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে সেগুলোর মাঝে সত্যবাদিতা অন্যতম। এটি একটি সুউচ্চ আদর্শ। মহামানবগণই এ গুণটি অর্জন করেন। আর অপদার্থরা এ থেকে পিছিয়ে থাকে। এ কারণেই এটি ছিল সমস্ত নবীগণের অবিচ্ছিন্ন গুণ। ঠিক এর উল্টো ছিল মুনাফিকদের অবস্থা। এ বিষয়ে উৎসাহ দেয় এমন অনেক দলিল প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١١٩ ﴾ [التوبة: ١١٩]

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।'[26]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً».

'তোমরা সত্যবাদি হও। কেননা সত্য মানুষকে পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। বান্দা সত্য কথাকে আঁকড়ে ধরলে এক সময় সে আল্লাহর নিকট সিদ্দিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তোমরা মিথ্যা বর্জন কর। কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। বান্দা মিথ্যার আশ্রয় নিতে থাকলে একসময় আল্লাহর দরবারে মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।'

সত্যবাদিতার প্রকারভেদ :

সত্যবাদিতা তিন প্রকার।

(১) অন্তরের সততা: মুমিন বান্দা ঈমানের ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সত্যবাদী হবে, যাতে করে বাহ্যিক রূপ ভিতর গত অবস্থার বিপরীত না হয় এবং আমল যেন দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত না হয়।

(২) কর্মের সততা : এটি বান্দা ও আল্লাহর মাঝে হতে পারে, আবার বান্দা ও মাখলুকের মাঝেও হতে পারে। মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বাস্তবায়ন ঘটাবে এবং ধোঁকা দেবে না। আর ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করবে না। আল্লাহ বলেন—

﴿ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ ﴾ [الاحزاب: ٢٣]

'মুমিনদের মাঝে এমন কতিপয় মহাপুরুষ রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার বাস্তবে রূপ দিয়েছেন।'

(৩) কথায় সততা : কোনো ব্যক্তি বাস্তবতার বিপরীত সংবাদ না দেওয়া, আর কথা ও কাজে অমিল না হওয়া। আল্লাহ বলেন—

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٣ ﴾ [الصف: ٢، ٣]

'হে ঈমানদার বান্দাগণ, তোমরা যা কর না তা কেন বল? আল্লাহর নিকট কঠিন অপরাধ হলো যা তোমরা কর না, তা সম্পর্কে

তোমাদের বলা।[27]

সত্যের ফলাফল

সত্যের ফলাফল অনেক। তন্মধ্যে—

(১) সত্য নেক আমলের দিকে ধাবিত করে আর নেক আমল জান্নাতের পথ দেখায়।

(২) সত্যবাদী আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের নিকট প্রিয়।

(৩) সত্য মানুষকে ইহকাল ও পরকালের ক্ষতি থেকে সংরক্ষণ করে।

সত্যের বিপরীত মিথ্যা

মিথ্যা এমন একটি কাজ যা ইচ্ছাকৃত ও উপহাস—উভয় অবস্থাতেই নিষিদ্ধ।

প্রকারভেদ : এটি বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন :—

(১) আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ: যেমন—আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের ব্যাপারে না জেনে কথা বলা, অথবা আল্লাহ বলেননি এমন কিছু

---

[27] সূরা আস-সফ: ২-৩।

সম্পর্কে একথা বলা যে আল্লাহ তা‘আলা এটি বলেছেন। অথবা এভাবে বলা যে, আল্লাহ জানেন আমি এ কাজটি করেছি অথচ সে কাজটি করেনি—ইত্যাদি ইত্যাদি। এহেন কাজ মারাত্মক অপরাধ সন্দেহ নেই। আল্লাহ বলেন—

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الاعراف: ٣٣]

“আপনি বলুন, আমার প্রভু প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অশালীন কাজ হারাম করেছেন।”[28]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٣ ﴾ [الاعراف: ٣٣]

‘আর আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের না জেনে কথা বলা।’[29]

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন —

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١٦ ﴾ [النحل: ١١٦]

---

[28] সূরা আল-আ‘রাফ: ৩৩।

[29] সূরা আল-আ‘রাফ: ৩৩।

‘নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে তারা সফল হবে না।’[30]

(২) রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ: এটিও মারাত্মক মিথ্যা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«إنّ كذباً علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

‘আমার ওপর মিথ্যারোপ করা অন্য সাধারণ লোকের উপর মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যা বলল সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে স্থাপন করে নেয়।’

(৩) মিথ্যা সাক্ষ্য : কারণ দৃঢ়তার সাথে না জেনে কোনো ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়, যা কখনো উচিত নয়।

(৪) মিথ্যা শপথ: অতীতের কোনো ঘটনার ব্যাপারে মিথ্যা শপথ করে সাক্ষ্য দেওয়া।

(৫) ভিত্তিহীন কাহিনী তৈরি করা: অন্যকে হাসানো অথবা অবসর সময় কাটানোর জন্য এ ধরনের কাহিনী তৈরি করা হয়।

---

[30] সূরা আন-নাহল: ১১৬।

উল্লেখিত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সত্য ঘটনা বলাই যথেষ্ট।

(৬) না দেখে কোনো কিছু দেখার দাবি করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تر»

'সবচেয়ে কঠিন মিথ্যা হলো কোনো ব্যক্তি স্বীয় চোখকে এমন কিছু দেখানোর চেষ্টা করল যা চোখে দেখেনি।'

(৭) স্বপ্ন না দেখে মিথ্যা স্বপ্নের দাবি করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন –

«من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل».

'যে ব্যক্তি কিছু না দেখে মিথ্যা স্বপ্নের দাবি করে, পরকালে তাকে দুটি চুলের মাঝে গিরা দিতে বলা হবে। অথচ সে তা পারবে না।' এটি তার মিথ্যার শাস্তি।

ইমাম আহমদ রহ.-এর বর্ণনায় এসেছে, عذب يوم القيامة অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে তার শাস্তিস্বরূপ দুটি চুলকে গিরা দিতে বলা হবে। কিন্তু সে তা পারবে না।

মিথ্যার শাস্তি :

মিথ্যার শাস্তি প্রসঙ্গে অনেক বর্ণনা রয়েছে। সামুরা ইবনে জুনদুব রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বপ্ন বর্ণনা করছেন। তার বর্ণনা নিম্নরূপ—

«إنه آتاني الليلة آتيان، وإنهما قالا لي : انطلق ...، قال : فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى».

'রাত্রিকালে আমার নিকট দুইজন আগন্তুক এসে বললেন, চলুন। অতঃপর আমরা চলতে চলতে চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম, আরেক ব্যক্তি তার কাছে লোহার হুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে শায়িত ব্যক্তির চেহারার একপার্শ্বে এসে চোয়াল, নাক ও চক্ষু হুক দ্বারা ঘাড়ের পিছনে টেনে নিয়ে যায়। অতঃপর অপর পার্শ্বে গিয়ে এমনটিই করে। অপর পার্শ্ব শেষ করার পূর্বেই প্রথম পার্শ্ব ঠিক হয়ে যায়। অতঃপর আগের মত আবার শুরু করে। নবিজি বলেন : আমি বললাম "সুবহানাল্লাহ" এরা দু' জন কারা? ফেরেশতারা

বললেন : আমরা অচিরেই এদের সম্পর্কে আপনাকে বলব। শুনুন—যে ব্যক্তির চোয়াল, নাক ও চক্ষু টেনে উঠিয়ে ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, সে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়ে একটি মিথ্যা কথা প্রচার করে দেয়। ফলে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।'

মিথ্যার ভয়াল পরিণতি :

মিথ্যার খারাপ পরিণতি অনেক। তন্মধ্যে—

(১) মিথ্যা মুনাফিকদের অভ্যাস।

(২) মিথ্যা যে ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হয় আল্লাহর নিকট তার নাম মিথ্যাবাদীদের কাতারে লেখা হয়। এটি অত্যন্ত খারাপ দিক। কোনো ব্যক্তি তার পরিবার অথবা সঙ্গীদের নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হতে চায় না। অতএব সে কীভাবে তার স্রষ্টার নিকট এমনটি হতে চায়?

(৩) মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য।

(৪) কখনো কখনো দেখা সে সত্য বললেও তা গ্রহণ করা হয় না। কেননা লোকজন তার কথার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। ইবনে মুবারক রহ. বলেন : 'মিথ্যার সর্বপ্রথম শাস্তি হলো তার সত্য কথাও গ্রহণ না করা।'

মিথ্যা থেকে নিষ্কৃতির উপকরণ:

মিথ্যা থেকে মুক্তি লাভের অনেক পথ রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

(১) এহেন মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

(২) মিথ্যাবাদীর ভয়ানক পরিণতির কথা চিন্তা করা।

(৩) আল্লাহ তা'আলাকে পর্যবেক্ষক মনে করে এ কথা চিন্তা করা যে, তার ফেরেশতা বান্দাদের সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন।

(৪) ভবিষ্যতে মিথ্যাবাদীর সর্বপ্রকার কথা ও কাজ অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করা। সাথে সাথে মানুষের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার দিকটিও বিবেচনা করা।

(৫) একথা চিন্তা করা যে, প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি একমাত্র সত্যের মাঝেই। চাই তা দুনিয়াতে হোক কিংবা আখেরাতে, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মিথ্যার মাঝে মুক্তি দেখা যায়।

(৬) মিথ্যার দিকে আহ্বানকারী সকল কাজ থেকে দূরে থাকা। সে কাজগুলো নিম্নরূপ: অশালীন কাজে জড়িয়ে পড়া, যা তাকে মিথ্যা

বলে ওজর পেশ করতে বাধ্য করে। অধিক পরিমাণে অঙ্গীকার করা, যা তাকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ব্যাপারে সাহায্য করবে। মিথ্যাবাদী বন্ধুদের সাথে উঠা-বসা করা। অথবা ঐ সকল লোকদের সাথে চলা যারা তাকে মিথ্যার প্রতি উৎসাহ দান করে অথবা তার মিথ্যা কথা শুনে।

ধৈর্য

ধৈর্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ অর্জনে প্রতিটি মানুষই ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। কেননা আমল অল্প হোক কিংবা বেশি, তা আদায় করতে হলে উপযুক্ত ধৈর্যের প্রয়োজন। তাইতো এর প্রতি উৎসাহ দিয়ে অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।

ইবনে মাসঊদ রা. বলেন—

«الصبر نصف الإيمان».

“ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।”

আলেমগণ বলেন, ঈমানের অর্ধেক ধৈর্য ও বাকি অর্ধেক শুকরিয়া। ধৈর্যকে আরবীতে বলা হয় সবর। আর সবর শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে, আটকানো, ফিরানো, বাধা প্রদান।

আর শরিয়তের পরিভাষায় সবর (ধৈর্য) পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

(১) ওয়াজিব ধৈর্য : এটি আবার তিন প্রকার।

(ক) আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে নিজেকে নিবেদিত রাখা। যেমন, মুসলিমদের সাথে

জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। যাকাত আদায় ও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

(খ) গুনাহ থেকে ধৈর্যধারণ। অর্থাৎ পাপে জড়িত হওয়া থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। যেমন হারাম দৃষ্টি থেকে ধৈর্যধারণ, অবৈধ সম্পদ ছেড়ে দেওয়া। গীবত ও খারাপ বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ—ইত্যাদি।

(গ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিপদাপদের উপর ধৈর্যধারণ। সর্বসম্মতি ক্রমে এটি ওয়াজিব। অর্থাৎ হতাশা ও নৈরাশ্য প্রকাশ করা থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করা। কোন-রূপ অভিযোগ পেশ করা থেকে জিহ্বাকে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন কাজ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেফাযত করা। যেমন—গাল চাপটানো, জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলা প্রভৃতি। আত্মীয়-স্বজন কিংবা সম্পদ হারানো এবং অসুস্থতার উপর ধৈর্যধারণ এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, মানুষের কষ্ট দেওয়াও এর আওতাভুক্ত।

সবর বা ধৈর্যের বিপরীত হলো— অসন্তোষ তথা রাগ প্রকাশ করা, অভিযোগ করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া এবং উৎকন্ঠা ও নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। এর কারণে প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায়, বিপদ - মুসীবত আরো বেড়ে যায় এবং ঈমান হ্রাস পায়।

নেক কাজ করা ও অন্যায় - অসৎ কাজ থেকে ফিরে থাকা সম্পর্কিত ধৈর্য বিপদ-আপদের উপর ধৈর্য অবলম্বন করা থেকে উত্তম। এ অভিমত প্রকাশ করেছেন সা'ঈদ ইবনে যোবায়ের, মাইমূন ইবনে মেহরান প্রমুখ। আর ভালো কাজে ধৈর্যধারণ করা হারাম থেকে বেঁচে থাকার ধৈর্য থেকে উত্তম।

(২) মুস্তাহাব ধৈর্য : এটি হচ্ছে মাকরূহ কাজ ছেড়ে দেওয়া ও মুস্তাহাব আমলের ধৈর্য। যেমন—অপরাধীর মোকাবেলায় তার অনুরূপ অপরাধ না করা।

(৩) হারাম ধৈর্য : যেমন—মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত খানা-পিনা পরিত্যাগ করা, ধ্বংসাত্মক বস্তুর উপর ধৈর্যধারণ। যেমন—আগুন লাগলে তার উপর কিংবা পরিবারের কেউ অশ্লীল কাজ করতে চাইলে সে ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ ।

(৪) মাকরূহ ধৈর্যধারণ: মাকরূহ কাজে অথবা মুস্তাহাব ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ।

(৫) মুবাহ (জায়েয) ধৈর্য : ক্ষতি হয় না এ পরিমাণ সময় খাবার গ্রহণ না করা অথবা কিছু সময় ঠান্ডার উপর ধৈর্যধারণ।

ধৈর্যের ফযীলত :

ধৈর্য ধারণের ফযীলত অনেক। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :—

(১) ধৈর্যের প্রতিদান অসীম। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾﴾ [الزمر: ١٠]

'একমাত্র ধৈর্যশীলদের প্রতিদান হিসাব ছাড়া দেওয়া হবে।'[৩১]

যেহেতু সিয়াম ধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত, তাই এর প্রতিদানও বিনা হিসেবে দেওয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বনী আদমের প্রতিটি আমলের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাত শত গুণ দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন: সিয়াম ব্যতীত। কেননা সেটি আমার জন্যে, আর এর প্রতিদান আমিই দেব।'

(২) ধৈর্যশীলদের জন্যে মহা সুসংবাদ : আল্লাহ বলেন—

﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [البقرة: ١٥٥، ١٥٧]

---

৩১ যুমার: ১০

'আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন, যারা মুসীবতে আক্রান্ত হলে বলে—إنا لله وإنا إليه راجعون অর্থাৎ আমরা আল্লাহর জন্যেই এবং পরিশেষে তার কাছেই ফিরে যাব। প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের উপর শান্তি ও রহমত রয়েছে এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।'[৩২]

(৩) আল্লাহর বিশেষ সঙ্গ ও ভালোবাসা : আল্লাহ বলেন—

﴿وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ٤٦﴾ [الانفال: ٤٦]

'তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'[৩৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٤٦﴾ [ال عمران: ١٤٦]

আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন।[৩৪]

(৪) ধৈর্য উত্তম সম্পদ। আল্লাহ বলেন—

﴿وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٞ لِّلصَّٰبِرِينَ ١٢٦﴾ [النحل: ١٢٦]

---

৩২ বাকারা : ১৫৫-১৫৭

৩৩ আনফাল : ৪৬

৩৪ আল ইমরান : ১৪৬

আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তাহলে তা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম।[৩৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر».

"কোনো বান্দাকে ধৈর্যের মত উত্তম সম্পদ অন্য কিছু দেওয়া হয়নি।"[৩৬]

(৫) আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন—

﴿وَلَنَجۡزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٦﴾ [النحل: ٩٦]

'অবশ্যই ধৈর্যশীলদের আমলের চেয়েও উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে।'[৩৭]

সিয়াম সাধনায় ধৈর্যের অনুশীলন :

ধৈর্যের প্রকারসমূহের মাঝে সিয়াম সাধনা অন্যতম। কেননা এর মাঝে তিন প্রকার ধৈর্যই বিদ্যমান। এটি আল্লাহর আনুগত্যের উপর

---

৩৫ নাহল : ১২৬

৩৬ বুখারী : ১৩৭৬

৩৭ নাহল : ৯৬

ধৈর্য ধারণের প্রকৃত স্বরূপ। আবার বান্দা নফসের চাহিদার বিপরীত অবস্থান নেয় ফলে এটি গুনাহ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সবরেরস্বরূপ। পাশাপাশি নির্ধারিত কষ্ট-মুসীবতের উপর ধৈর্যধারণও এর মাঝে পাওয়া যায়। কেননা রোযাদারকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করতে হয়। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়ামের মাসকে সবরের মাস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر».

'সবর মাস তথা রমযান মাসের রোযা এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা পূর্ণ এক বছর রোযার সমতুল্য।'[৩৮]

ধৈর্য অর্জনে মুজাহাদার প্রয়োজন :

ধৈর্যের জন্যে মুজাহাদা ও অনুশীলনের প্রয়োজন। ভালো কাজ করা, খারাপ কাজ ছেড়ে দেওয়া, দুঃখ-বেদনা ও মুসীবতের সময় এবং মানুষ কষ্টে আক্রান্ত হলে—সর্বক্ষেত্রে এটি প্রয়োজন। অবশ্যই এ সমস্ত কাজে মানুষকে কষ্ট করতে হয়। কিন্তু ধৈর্যের পথ অবলম্বন

---

৩৮ আবু দাউদ : ২০৭৩

করার স্বরূপ আল্লাহ তা‘আলা তাকে সাহায্য করেন। অতঃপর দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পরিণতি লাভ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«ومن يتصبر يصبره الله».

যে ব্যক্তি ধৈর্যের অনুশীলন করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের তৌফিক দিয়ে দেন।[৩৯]

ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন। কেননা তিনি ধৈর্যদানকারী ও সাহায্যকারী। আল্লাহ বলেন—

﴿ وَٱصۡبِرۡ وَمَا صَبۡرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ﴾ [النحل: ١٢٧]

‘আর তুমি ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহর ইচ্ছাই তোমার ধৈর্যধারণের শক্তি।’[৪০]

আল্লাহ তা‘আলা আপন জাতির প্রতি মুসা আ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন—

---

৩৯ বুখারী : ১৩৭৬

40 নাহল : ১২৭

﴿ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓاْۖ﴾ [الاعراف: ١٢٨]

‘তোমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।’[৪১]

ভাল মানুষের ধৈর্য ও মন্দ লোকের ধৈর্যের মাঝে পার্থক্য :

ভাল মানুষ আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ করে। আর মন্দ মানুষ শয়তানের আনুগত্যে ধৈর্য ধরে। মন্দ লোকেরা কুপ্রবৃত্তির পিছনে অধিক ধৈর্য ধরে। আর আল্লাহর আনুগত্যে খুব কম সময় ধৈর্য ধরে। তারা শয়তানের আনুগত্যে সবকিছু প্রচুর পরিমাণে খরচ করে। কিন্তু আল্লাহর পথে সামান্য বস্তুও খরচ করার উপর ধৈর্যধারণ করে না। নফসের চাহিদা পূরণ করতে অনেক কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনে কোনো কষ্ট করতে চায় না।

নেয়ামতের উপর ধৈর্যধারণ :

অনেকে মনে করে ধৈর্য কষ্টদায়ক বিষয়ের সাথেই সংশিষ্ট। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যেভাবে কষ্টের উপর ধৈর্য ধরতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে নেয়ামত ও আনন্দদায়ক বিষয়ের উপর ধৈর্য ধারণ করতে হয়। বরং এ ব্যাপারে ধৈর্যধারণ কষ্টের সময়ের ধৈর্যের চেয়ে বেশি কঠিন। আর এ কারণেই সত্যবাদীগণ এ গুণে গুণান্বিত হয়

---

৪১ আ‘রাফ : ১২৮

এবং অন্যরা এর থেকে গাফেল থাকে। কারণ নেয়ামতের উপর সবর করার বিষয়টি শক্তি সামর্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন—

والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء

‘মানুষের সুসময়ে ধৈর্যধারণ মুসীবতে ধৈর্যধারণের চেয়ে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ।’

আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ ٩ وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّيٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١١ ﴾ [هود: ٩، ١١]

‘আমি মানুষকে অনুগ্রহ করার পর আবার তা ছিনিয়ে নিয়ে গেলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর মুসীবতের পর নেয়ামত প্রদান করলে সে বলে, আমা থেকে দূরাবস্থা চলে গেল। সে

খুশি হয় এবং গর্ব করে। তবে যারা ধৈর্যধারণ করে এবং নেক আমল করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান।[৪২]

সুদিনে নেয়ামতের উপর ধৈর্যের দিকসমূহ :

(১) নেয়ামতের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হওয়া এবং তা পেয়ে ধোঁকায় না পড়া। গর্ব ও অহংকার না করা। অকৃতজ্ঞ না হওয়া এবং এমনভাবে খুশি না হওয়া, যা দেখে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন।

(২) নেয়ামত অর্জনে সম্পূর্ণ ডুবে না পড়া। যার ফলে অন্যান্য দিকসমূহ থেকে গাফেল হয়ে হক ও বাতিলের পার্থক্য না করে তাতে ডুবে থাকা হয়।

(৩) আল্লাহ তা'আলার হক আদায়ে ধৈর্যধারণ।

(৪) হারাম কাজে তা খরচ করা থেকে নিজেকে আঁকড়ে রাখা। নিজের নাফসকে এমনভাবে প্রবৃত্তির পিছনে ছেড়ে না দেওয়া, যা তাকে হারাম পথে ধাবিত করে।

ধৈর্যের আদব সমূহ :

---

৪২ হুদ : ৯-১১

ধৈর্যধারণের অনেক আদব রয়েছে।

(1) মুসীবত আসার প্রথম ধাপেই ধৈর্যধারণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

«إنــما الصبر عنــد الصــدمة الأولى».

‘প্রথম আঘাতের ধৈর্যধারণই প্রকৃত ধৈর্যধারণ।’[৪৩]

(2) মুসীবতের সময় “ইন্নালিল্লাহ” পড়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ ﴾ [البقرة: ١٥٦]

“যখন তাদের উপর মুসীবত আসে তখন তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তার দিকেই ফিরে যাব।[৪৪]

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—কোনো মুসলিম মুসীবতে পড়লে যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী إنا لله وإنا إليه راجعــون এবং নিম্নোক্ত দো‘আ পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তাকে উত্তম বস্তু দান করবেন। اللهــم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيــراً منها উম্মে সালামা রা. বলেন, যখন আবু

---

১ বুখারী : ১২০৩

২ বাকারাহ্ : ১৫৬

সালামা ইন্তেকাল করলেন তখন আমি বললাম মুসলিমদের মাঝে আবু সালামার চেয়ে উত্তম আর কে-ই বা আছে? অল্প সময়ের মাঝেই আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্ধারণ করলেন।

(3) মুসীবতের সময় জবান ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির থাকা। তবে উঁচু আওয়াজ ও চিৎকার-চেঁচামেচি না করে কাঁদা বৈধ।

সচ্চরিত্র

সচ্চরিত্রতা বলতে বুঝায়, ‘হারাম ও অসুন্দর কাজ থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করা।’

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে সচ্চরিত্রবান হওয়ার আদেশ করতেন। আবু সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত, হিরাক্লিয়াস বাদশা তাকে নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, নবী তোমাদেরকে কি করার আদেশ দেয়? আমি বললাম তিনি বলেন—‘তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কাউকে শরিক করো না। তোমাদের পূর্বপুরুষ যা বলতেন তোমরা তা ছেড়ে দাও। আর আমাদেরকে সালাত, সততা ও সচ্চরিত্র ও আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার আদেশ করেন।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রভুর নিকট দো‘আ করতেন—

«اللهــم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى».

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হেদায়েত, তাকওয়া, সচ্চরিত্র ও অভাব-মুক্তির প্রার্থনা করছি।

সচ্চরিত্রের প্রকারসমূহ:

(১) হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকা: এটি ওয়াজিব। এর উপকারিতা হলো, জাহান্নাম থেকে মুক্তি। কেননা, যে দেহ হারাম দ্বারা লালিত হয় তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান। হারাম খাদ্য থেকে বেঁচে থাকলে দো‘আ কবুল হয় এবং আল্লাহ বিশেষভাবে তাকে হেফাযত করেন।

(২) ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকা : আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

﴿لَا يَسۡـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلۡحَافٗاۗ﴾ [البقرة: ٢٧٣]

তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না।[45]

আউফ ইবনে মালেক রহ. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সহ কয়েকজন সাহাবিকে বললেন: ألا تبايعـــون؟ তোমরা কী বাই‘আত গ্রহণ করবে না? সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমরা তো বাই‘আত গ্রহণ করেছি। নতুন করে কোনো বিষয়ে আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করব? তিনি বললেন, তোমরা মানুষের নিকট কিছু চেওনা।

[45] সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৩।

উপকারিতা :

- ☐ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে আশ্রয় না নেওয়া।
- ☐ তাঁর উপর সত্যিকারার্থে ভরসা করা।
- ☐ নিজের সম্মান রক্ষা করা।
- ☐ সৃষ্টির কাছে ভিক্ষা করার লাঞ্ছনা থেকে নিজেকে হেফাযত করা।

সচ্চরিত্রতার ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারভেদ:

এক্ষেত্রে মানুষ কয়েক ভাগে বিভক্ত। সকলে এক পর্যায়ের নয়। কারো ক্ষেত্রে ভিক্ষা না করা ওয়াজিব। যেমন প্রয়োজন না হলে সম্পদ না চাওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ বাড়ানোর জন্যে মানুষের নিকট ভিক্ষা চায়, সে যেন আগুনের জ্বলন্ত কয়লা চাইল। অতএব, তা কম করুক বা বেশি করুক সেটা তার ইচ্ছা।

কারো কারো ক্ষেত্রে চাওয়া ত্যাগ করা ওয়াজিব নয়। তাদের ক্ষেত্রে চাওয়া ত্যাগ করা মর্যাদার বিষয়। যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখিত আউফ ইবনে মালেকের বর্ণনায় এসেছে,

«فلقـد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه».

'আমি তাদের কাউকে কাউকে দেখেছি ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায় হাতের লাঠি পড়ে গেলে, তা উঠিয়ে দেওয়ার জন্যে অন্য কাউকে বলতেন না।'

(৩) গোপনাঙ্গের পবিত্রতা : এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অশ্লীল কাজ ও উপকরণ থেকে গোপনাঙ্গ সংরক্ষণ করা। এটি ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন—

﴿ وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٣٣]

'যারা বিবাহ করতে পারে না, তারা যেন নিজেদেরকে হেফাযত করে।[46]

তিনি আরো বলেন—

﴿ قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ ﴾ [النور: ٣٠]

'(হে নবী) আপনি মুমিন পুরুষদের বলেন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নিচু করে রাখে এবং তাদের গোপনাঙ্গ হেফাযত করে। এটাই

[46] সূরা আন-নূর: ৩৩।

তাদের জন্যে পবিত্র পন্থা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।[47]

উপকারিতা :

☐ গোপনাঙ্গের হেফাযতকারীকে আল্লাহ তা'আলা আরশের নীচে ছায়া দেবেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .... ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال : إني أخاف الله».

'সাত প্রকার ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা আরশের নীচে ছায়া দেবেন। তাদের মাঝে ঐ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত যাকে কোনো সুন্দরী সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী কু-কর্মের দিকে আহ্বান করলে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

☐ জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যকার মুখ ও দুই পায়ের মধ্যকার গুপ্তাঙ্গ হেফাজতের জিম্মাদার হলো, আমি তার জান্নাতে প্রবেশের দায়িত্ব নিলাম।

গোপনাঙ্গ হেফাযতের উপকরণসমূহ :

☐ দৃষ্টির হেফাযত।

☐ যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথে দ্রুত বিবাহ।

☐ বিবাহে অপারগ হলে সিয়াম সাধনা।

☐ নারীর পূর্ণ হিজাব গ্রহণ।

☐ বেশির ভাগ সময় ঘরে অবস্থান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :—

﴿ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ ﴾ [الاحزاب: ٣٣]

“আর তোমরা (নারীরা) ঘরে অবস্থান কর এবং জাহেলী যুগের নারীদের মত খোলামেলা চলাফেরা কর না।”[48]

☐ অপরিচিত নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : إياكم والدخول على النساء “তোমরা নারীদের নিকট প্রবেশ করার ব্যাপারে সতর্ক থাক।”

☐ কোন নারীর সাথে মুসাফাহা না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : إني لا أصافح النساء “আমি নারীর সাথে মুসাফাহা করি না।”

☐ পুরুষ-নারী একসাথে মেলামেশা না করা।

---

[48] সূরা আল-আহযাব: ৩৩।

□ অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে এমন সকল কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ﴾ [الاسراء: ٣٢]

'আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না।'

অশ্লীল কথা বা কাজের কথা শোনা, অশালীন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত, অশ্লীল ছবি বা সিনেমা দেখা, অশ্লীল কিছু পাঠ করা—এ সবই আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

সচ্চরিত্রতা ও পবিত্র থাকার বিষয়টিতে দুর্বলতা আসার কারণসমূহ :

(1) অভিভাবক ও মুরব্বীগনের পক্ষ থেকে যথাযথ লালন-পালন ও নজরদারি দুর্বল হওয়া।

(2) হারাম বস্তুর প্রতি অবাধে দৃষ্টিপাত। এটি ফিতনার সবচেয়ে বড় কারণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, فزنا العينين النظر 'চোখের ব্যভিচার হলো দৃষ্টিপাত।'

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকস্মিক দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে বললেন।

বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আলী, তুমি প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিয়ো না। প্রথমটি তোমার জন্যে জায়েয বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টির অধিকার নেই।

(3) যুবক-যুবতীদের দেরি করে বিবাহ দেওয়া।

(4) এমন দেশে ভ্রমণ করা, যেখানে বেহায়া ও উলঙ্গপনার সয়লাব রয়েছে।

(5) অপরিচিত নারীর সাথে মেলামেশা ও নির্জনবাসের ব্যাপারে অবহেলা করা। পূর্বসুরীগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক করতেন। উবাদা ইবনে সামেত রা. ছিলেন একজন বয়োজ্যাষ্ঠ আনসারী সাহাবি। তিনি বলেন—তোমরা দেখ না আমি অন্যের সাহায্য ব্যতীত দাঁড়াতে পারি না এবং নরম খাবার ব্যতীত খেতে পারি না। আমার সাথি (পুরুষাঙ্গ) অনেকদিন হল মরে গিয়েছে। সারা পৃথিবীর বিনিময়ে হলেও কোনো অপরিচিত নারীর সাথে নির্জনে থাকা আমার পছন্দ হয় না। কেননা শয়তান হয়তোবা আমার জিনিসটিকে নাড়া দিতে পারে।

(6) যে ব্যক্তি নিজে পবিত্র থাকতে চায় না এবং সমাজকে কলুষমুক্ত রাখতে চায় না এমন লোকের সাথে উঠা-বসা করা। অতএব, এ ধরনের লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করে ভালো লোকদের সঙ্গ তালাশ করা উচিত।

(7) অধিক অবসর। তাই দ্বীন-দুনিয়ার উপকার হয়, এমন কাজে নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখা উচিত। যাতে শয়তানি চিন্তা-ভাবনা আক্রমণ করতে না পারে।

(8) সর্বশেষ কথা হলো, শরিয়তের হুকুম আহকাম ছেড়ে দেওয়াই হলো চারিত্রিক দুর্বলতার সবচেয়ে বড় কারণ।

গোপনাঙ্গ সংরক্ষণের সু-ফল :

(1) চরিত্রবান ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের দায়িত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর।

(2) কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ।

(3) ব্যক্তির পবিত্রতা তার পরিবার ও মাহরাম আত্মীয়দের পবিত্রতার কারণ। যে ব্যক্তি হারামে লিপ্ত হয়, তার নিজের ও পরিবারের উপর যে কোনো সময় এর খারাপ পরিণতি নেমে আসতে পারে।

(4) ধ্বংসাত্মক রোগ, ফাসাদ, আপদ-বিপদ ও অনিষ্ট থেকে সমাজ নিরাপদ থাকার বড় মাধ্যম হলো চারিত্রিক পবিত্রতা।

(5) সাধারণ ও বিশেষ শাস্তি এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকার মাধ্যম পবিত্রতা।

বদান্যতা ও পরার্থপরতা

দান করার বিষয়টি উদার মনে সম্পদ ব্যয় করার উপরই সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যার অনেক স্তর ও শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। বদান্যতার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে—আল্লাহর পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করা। কবি বলেন—

يجود بالنفـــس إذ ضن البخيل بها ❁ والجود بالنفـــس أقصى غاية الجود

'তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করছেন, যদিও কৃপণ ব্যক্তি আপন জীবন দান করতে চায় না, মূলত: জীবন উৎসর্গ করাই হলো উঁচু পর্যায়ের বদান্যতা।'

বদান্যতার আরেকটি স্তর হচ্ছে, মুমিনদের কল্যাণে সময় দান করা এবং শিক্ষার্থী ও প্রশ্নকারীর জন্যে ইলম বণ্টন করা।

সকল মানুষের মাঝে সাহাবীগণই ছিলেন সবচেয়ে বেশি দানশীল।

সাহাবাদের জীবন উৎসর্গের নমুনা :

যে ব্যক্তি সাহাবীগণের জীবন-চরিত অধ্যয়ন করে, সে আল্লাহর রাহে সাহাবীগণের জীবন উৎসর্গের অনেক বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে

পাবে। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

(1) আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে বলেন :—

«قوموا إلي جنة عرضها السموات والأرض، فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه : يا رسول الله ، جنة عرضها السموات و الأرض؟ قال : نعم، قال بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحملك على قولك : بخ بخ ، قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال : فإنك من أهلها، فأخرج تمرات من قرنه ، فجعل يأكل منهن ، ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة ، قال : فرمى بما كان معه من التمر ، ثم قاتلهم حتى قتل».

"তোমরা উঠ এবং জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন বরাবর বিস্তৃত। একথা শুনে উমাইর ইবনে হামাম রা. বললেন—হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান ও যমীন বরাবর? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন—বাখ! বাখ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জন্যে বাখ! বাখ! শব্দ উচ্চারণ করলে? বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এ জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার আশায় এমনটি বলেছি। রাসূল বললেন, তুমি জান্নাতের অধিবাসী। তিনি তখন তার ব্যাগ থেকে কয়েকটি খেজুর বের করলেন এবং খেতে

শুরু করলেন। অতঃপর বললেন আমি যদি সবগুলো খেজুর খাওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে তা অনেক দীর্ঘ জীবন। পরে তিনি অবশিষ্ট খেজুরগুলো নিক্ষেপ করে যুদ্ধে নেমে গেলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।[৪৯]

(2) কোনো এক যুদ্ধে আবু মূসা আশ'আরী রা. অংশগ্রহণ করেন। তিনি বললেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إن أبواب الجنة تحت ظلال الســـــيوف...»

'নিশ্চয় জান্নাতের দরজাসমূহ তলোয়ারের ছায়ার নীচে আছে।' একথা শুনে অগোছালো পোশাক নিয়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল হে আবু মূসা; তুমি একথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছ? আবু মুসা রা. বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল এবং বলল أقــــرأ عليـــــكم الـــــسلام আমি তোমাদেরকে সালাম করছি। অতঃপর তরবারির খাপ উন্মুক্ত করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শহীদ হয়ে গেল।[৫০]

আল্লাহর রাহে সম্পদ উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত :

---

৪৯ মুসলিম : ৩৫২০

৫০ মুসলিম : ৩৫২১

(1) উমর রা. ৪০০ (চার শত) দিনার হাতে নিয়ে তার গোলামকে বললেন, এগুলো আবু উবাইদার নিকট নিয়ে যাও। অতঃপর দূরে সরে থেকে লক্ষ্য কর তিনি সেগুলো কি করেন? গোলাম সেগুলো নিয়ে তার নিকট গিয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন এগুলো গ্রহণ করতে বলেছেন। তিনি (আবু উবাইদা) বললেন, আল্লাহ তার উপর দয়া করুক। অতঃপর তার বাঁদীকে বললেন, যাও সাতটি দিনার নিয়ে অমুকের নিকট যাও, আর এই পাঁচটি অমুকের নিকট নিয়ে যাও। ঐ মজলিসে বসেই তিনি সবগুলো দিনার শেষ করে ফেললেন। অতঃপর গোলাম উমর রা. এর নিকট ফিরে আসল এবং পূর্ণ ঘটনা খুলে বলল। এদিকে উমর রা. ঐ পরিমাণ দিনার মু'আয ইবনে জাবাল রা.-এর জন্যে গণনা করে রাখলেন এবং সেগুলোও পাঠিয়ে দিলেন। মু'আয রা. বললেন, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখুক। হে বাঁদী অমুক ব্যক্তির ঘরে এ পরিমাণ নিয়ে যাও। আর অমুক ঘরেও দিয়ে আস। মুয়ায রা.-এর স্ত্রী জানতে পেরে বললেন, আল্লাহর কসম আমরাও মিসকীন-দারিদ্রক্লিষ্ট। অতএব, আমাদেরও কিছু দিন। তখন পাত্রে মাত্র দুই দিনার অবশিষ্ট ছিল। তিনি মাত্র দুই দিনারই স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন। গোলাম এসে উমর রা.-কে ঘটনা শোনালে তিনি খুশি হলেন এবং বললেন তারা সকলে ভাই ভাই। সবাই সবার উপকারে এগিয়ে আসে।

(2) তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-এর দানের কাহিনি উল্লেখযোগ্য। তাকে বলা হত طلحة الجود (দানবীর তালহা) ও طلحة الفيّاض (পরোপকারী তালহা)। একবার হাযরামাওত থেকে তার নিকট কিছু মাল আসল। পরিমাণ সাত হাজার। তিনি ঐ রাতে খুব পেরেশান অবস্থায় ছিলেন। তার স্ত্রী তাঁকে বললেন আপনার কি হলো? রাত থেকে কি যেন চিন্তা করছেন? তালহা রা. বললেন : ঐ ব্যক্তির রব সম্পর্কে তার কি ধারণা যে এতগুলো মাল ঘরে রেখে রাত্রিযাপন করে? তার স্ত্রী বললেন—আপনার বন্ধুদের পথ ধরে চলতে পারেন না? যখন আপনি সকালে উপনীত হবেন তখন মালগুলো বণ্টন করে ফেলবেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন আল্লাহ তোমাকে তৌফিক দান করুক। তুমি তৌফিক প্রাপ্তের মেয়ে তৌফিকপ্রাপ্তা। (অর্থাৎ আবু বকরের মেয়ে উম্মে কুলছুম।) সকাল হলে তিনি সব সম্পদ মুহাজির ও আনসারগণের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। স্ত্রী তাকে বললেন—আমরা কি এ মালের কোনো অংশ পাই না? তিনি বললেন তুমি সারাদিন কোথায় ছিলে? এখন যা বাকি আছে তা তুমি নিয়ে নাও। থলের মাঝে তখন মাত্র এক হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল।

পরার্থপরতা ও অপরকে প্রাধান্য দেওয়া :

অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্যে পরার্থপরতা ও দানের অর্থ বিদ্যমান। বরং তাতে দানের অর্থ আরো বেশি লুক্কায়িত আছে। কেননা, নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার অনেকগুলো স্তর রয়েছে।

(1) সব কিছুর উপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া। দুনিয়ার উপর আখেরাতকে এবং ধ্বংসযোগ্য অস্থায়ী জিনিসের উপর স্থায়ী জিনিসকে প্রাধান্য দেওয়া। এটি সর্বোচ্চ স্তর।

(2) আল্লাহর সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া। অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যকে দান করা। আর এসব কিছুই হতে হবে আল্লাহ তা‘আলাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে। প্রশংসা কিংবা পদ-লাভের উদ্দেশ্যে নয়।

এ প্রকারের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে—অপরের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করা। কোনো কোনো সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেন—

نفـــــسي فداك، ونحــــري دون نحـــرك.

‘আমার জীবন আপনার জন্যে উৎসর্গ করলাম।’ আমার ঘাঁড় আপনার ঘাঁড়ের নিকটে।

আরো একটি স্তর হচ্ছে—সম্পদের দ্বারা অপরকে প্রাধান্য দেওয়া। আল্লাহ আনসারদের প্রশংসা করেছেন যখন তারা মুহাজির ভাইদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দিয়েছে—

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩ ﴾ [الحشر: ٩]

'যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং ঈমান আনয়ন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে। মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।'[৫১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সকল উম্মত অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন।

(1) সাহল ইবনে সা'দ রা. বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একজন মহিলা একটি চাদর নিয়ে আসল। এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে আমি এই

---

৫১ হাশর-৯।

চাদরটি পরাতে চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব আগ্রহ সহকারে চাদরটি গ্রহণ করে পরিধান করলেন। এক সাহাবী রাসূলের গায়ে চাদরটি দেখে বললেন—চাদরটি কতই না সুন্দর। এটি আমাকে পরিয়ে দিন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস থেকে চলে গেলে উপস্থিত সাহাবীগণ লোকটিকে তিরস্কার করতে লাগলেন। তারা বললেন, তুমি যখন দেখলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগ্রহ সহকারে চাদরটি পরিধান করেছেন তখন তোমার জন্যে তাঁর চাদরটি চাওয়া ঠিক হয়নি। তুমি তো ভালো করেই জান কেউ কিছু চাইলে তিনি কখনও না বলেন না। তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিধেয় বস্ত্রের বরকত অর্জন করতে চেয়েছি, আমার আশা এটি যেন আমার কাফন হয়।

(2) আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ক্ষুধার কারণে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিগণের নিকট পাঠিয়ে কিছুই পেলেন না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন কে আছে, যিনি আজকের রাতে এ ব্যক্তির মেহমানদারী করতে পারবে? আল্লাহ তার উপর রহম করুক। একজন আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে

বললেন, আমি পারব। তিনি ঐ ব্যক্তিকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেহমান। অতএব কোনো কিছু তাকে না দিয়ে রেখে দিও না। স্ত্রী বললেন, আমার নিকট বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই নেই। সাহাবী বললেন, রাতে যখন বাচ্চারা খাবার চাইবে তখন তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আর তুমি বাতি নিভিয়ে ফেলবে। আমরা আমাদের পেট আজ রাতে বেধে রাখব। স্ত্রী তা-ই করলেন। সাহাবী সকাল বেলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক স্বামী ও স্ত্রীর কাজ দেখে আশ্চর্য হয়েছেন অথবা হেসেছেন।

মসজিদের আদব

মসজিদের অবস্থান

মানুষের জীবনে মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম, মসজিদের মান-সম্মান ও অবস্থান অনেক উপরে, এর সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করছি।

1. মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ঘর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله...»

"কোনো সম্প্রদায় যখন আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্য থেকে কোনো এক ঘরে একত্রিত হয়...।"[52]

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۝١٨ ﴾ [الجن: ١٨]

"আর এই মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।"[53]

---

[52] সহীহ মুসলিম, ২৬৯৯।

[53] সূরা আল-জিন্ন, ১৮।

উলামায়ে কেরাম বলেন: উল্লেখিত হাদীস ও আয়াতে মসজিদকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে উল্লেখ করার মাধ্যমে মূলত মসজিদের মর্যাদা ও গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

2. মসজিদ পৃথিবীতে সর্বোত্তম জায়গা এবং আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় স্থান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها».

আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম জায়গা মসজিদ এবং সর্ব-নিকৃষ্ট জায়গা বাজার।[54]

3. মসজিদ ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি ফরয নামাজ আদায়ের স্থান ।

4. মসজিদ মুসলিমদের সমবেত হওয়া, পরিচয় লাভ করা এবং সম্পর্ক তৈরি করার স্থান। সেখানে কুরআন পাঠের ক্লাস হয় এবং জ্ঞান-শিক্ষার পাঠ দান করা হয়।

5. মসজিদের গুরুত্ব এবং মর্যাদার আরো একটি প্রমাণ হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করার পর সর্বপ্রথম মসজিদ বানানোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। আর মদিনাতে আগমনের পর সেটাই তার সর্বপ্রথম কাজ।

---

[54] মুসলিম, ৬৭১।

মসজিদ আবাদ করার ফযিলত:

মসজিদ আবাদ দুই প্রকার:

(ক) বাহ্যিক আবাদ তথা নির্মাণ করা, আর এর অনেক ফযিলত রয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة».

"যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর তৈরি করে দেবেন।"[55]

হাদীসে সঠিক নিয়তে মসজিদ নির্মাণকারীর জন্যে জান্নাতে প্রবেশের শুভ সংবাদ আছে। কারণ জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার ঘর নির্মাণ করাই প্রমাণ করে যে সে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে।

(খ) এতো গেল বাহ্যিকভাবে মসজিদ আবাদের কথা। মসজিদ আবাদের আরেকটি দিক রয়েছে যা প্রকৃত অর্থে আবাদ করা, আর সেটি এভাবে যে, সেখানে নামাজ পড়া, জিকির করা, কুরআন

---

[55] মুসলিম, ৫৩৩।

তেলাওয়াত করা এবং অন্যান্য ইবাদত করা; এর জন্য অগণিত পুরস্কার আছে মর্মে বহু আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح»

"যে সকাল বিকাল মসজিদে গমনাগমন করবে, প্রত্যেকবার যাতায়াতের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করবেন।"[56]

আবাদের উভয় দিক শামিল হয়, আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী,

﴿ إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٨ ﴾ [التوبة: ١٨]

"নিঃসন্দেহে তারাইতো আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি এবং সালাত কায়েম করে,

[56] মুসলিম, ৬৬৯।

যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেই ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[57]

মসজিদ সম্পর্কিত বিধানাবলী:

মসজিদের অনেক আদব ও বিধান রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

1. কারুকার্য বাদ দিয়ে সুন্দর করে বিল্ডিং বানানো, কেননা কারুকার্য করা বিদ‘আত। এতে নামাজির মনোযোগ নষ্ট হয় এবং প্রতিযোগিতা ও অহংকারের দরজা খুলে যায়। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে মসজিদ সাজাতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। ইবনে আব্বাস বলেন, তারা অবশ্যই মসজিদসমূহ সাজাবে, যেমন ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা সাজাতো।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, উমর রা. মসজিদ বানাতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমি মানুষকে বৃষ্টি থেকে হেফাযত করছি। সাবধান! লাল ও হলুদ রং ব্যবহার করবে না। মানুষ ধাঁধাঁয় পড়ে যাবে। আনাস রা. বলেন, মসজিদ নিয়ে মানুষ গর্ব ও প্রতিযোগিতা করবে, কিন্তু খুব কম লোকই মসজিদ আবাদ করবে।

2. কবরের উপর মসজিদ তৈরি করা কিংবা মসজিদে কবর বানানো হারাম। কেননা এটি মূলত কবরের সম্মান প্রদর্শণ এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কবরের ইবাদত করার মাধ্যমে শিরকের রাস্তা তৈরি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে।[58]

জুন্দুব রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পূর্বে পাঁচটি অসিয়ত শুনেছেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:—

«...وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك».

...তোমাদের পূর্ববর্তীরা নবী ও সৎ লোকদের কবরকে মসজিদ বানাতো। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি

---

[58] মুসলিম, ৫২৯।

তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করছি।[59] সুতরাং কবরস্থানে জানাযার নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নামাজ বৈধ নয়।

3. মসজিদ সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা। অপবিত্র করা বা কষ্টদায়ক জিনিস সেখানে রাখা হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها».

মসজিদে থুতু ফেলা অন্যায়, তার কাফ্ফারা হল পুতে ফেলা।[60]

পুতে ফেলা সম্ভব না হলে, অন্যভাবে পরিষ্কার করতে হবে। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দেওয়াল থেকে থুতু সরিয়ে ফেলেছিলেন।

4. মসজিদে নম্রতা ও স্থিরতার সাথে যাওয়া। তাড়াতাড়ি বা দৌঁড়িয়ে না যাওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—
«وإذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».

---

[59] মুসলিম, ৫৩২।

[60] নাসাঈ, ৭২৩।

“যখন তোমরা নামাজে আসবে অবশ্যই ধীর-স্থিরতার সাথে আসবে। যতটুকু পাবে, আদায় করবে। আর যতটুকু ছুটে যাবে, পূর্ণ করবে।”[61]

৫. মসজিদে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা ও বাম পা দিয়ে বের হওয়া। আনাস রা. বলেন—সুন্নত হলো যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর যখন বের হবে বাম পা দিয়ে বের হবে।

প্রবেশ এবং বের হবার দো‘আ পড়বে। রাসূলের নির্দেশ :—

«إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللّٰهُمَّ افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللّٰهُمَّ إنى أسألك من فضلك».

“যখন কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বলবে :

اللّٰهُمَّ افتح لي أبواب رحمتك.

আর যখন বের হবে তখন বলবে : اللّٰهُمَّ إني أسألك من فضلك

[61] মুসলিম, ৬০২।

৬. মসজিদে আগে আগে যাওয়া এবং প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার প্রতি আগ্রহী থাকা—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন—

«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا على ذلك، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه».

"যদি মানুষ জানতে পারত, আজান দেওয়া এবং প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার মাঝে কি আছে, আর লটারি ব্যতীত সেটি পাওয়া সম্ভব হত না, তাহলে অবশ্যই তার জন্য লটারির ব্যবস্থা করত। এবং যদি জানতে পারত মসজিদে আগে আসার মাঝে কি ফযিলত আছে, তাহলে তার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো।"[62]

আর যিনি মসজিদে আগে আসবেন, কোনো কারণ ছাড়া তার প্রথম কাতার বাদ দিয়ে পিছনে বসা উচিত নয়। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'যে ব্যক্তি আগে আসল এবং কোনো ওজর ব্যতীতই প্রথম কাতার ছাড়া অন্য জায়গায় বসল, সে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করল। পিছনে হটে থাকার দরুন সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

[62] মুসলিম, ৪৩৭।

«تقدموا، فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله».

তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও এবং আমার এক্তেদা কর। আর তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের এক্তেদা করবে। একটি সম্প্রদায় সব সময় পিছনে থাকবে এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পিছনে ঠেলে দেবেন।[63]

মসজিদে আগে আসার মাঝে অনেক উপকার। যথা—জামাতের শুরু থেকে অংশগ্রহণ, কুরআন পড়ার সুযোগ, নফল আদায় করার সুযোগ, ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমার দো'আ করতে থাকে। যতক্ষণ নামাজের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষণ নামাজরত আছে বলে ধরা হবে এবং প্রথম কাতার পাওয়া—ইত্যাদি।

৭. মসজিদে প্রবেশকারী দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় ব্যতীত বসবে না। আবু কাতাদাহ আনসারী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»

---

[63] মুসলিম, ৪৩৮।

“তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত না পড়া ব্যতীত কখনোই বসবে না।”[64]

ইমাম সাহেব জুমার নামাজে খুতবা দানরত থাকা অবস্থায় প্রবেশ করলেও এ’দুই রাকাত আদায় করবে তবে একটু সংক্ষিপ্তাকারে আদায় করবে। জাবের রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» .

“ইমামের খুতবা চলা অবস্থায় তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে।”[65]

৮. মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা, নামাজি বা তেলাওয়াতকারীকে বিরক্ত করা মাকরূহ। চাই তা সাধারণ কথা হোক বা উচ্চস্বরে কুরআর পাঠ করা হোক। পাশের লোককে কষ্ট দেওয়া নিষেধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[64] মুসলিম, ৭১৪।

[65] মুসলিম, ৮৭৫।

«إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن».

নামাজি ব্যক্তি তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে। তার খেয়াল রাখা উচিত যে, সে কি বলছে। তোমরা কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে একে অন্যের উপর শব্দ কর না।[66]

৯. মুক্তাদী সর্বদা ইমামের অনুসরণ করবে, প্রত্যেক আমল তার পর পরই সাথে সাথে আদায় করবে। ইমামের আদায়ের আগে করবে না, সাথেও করবে না। আবার ইমাম থেকে অনেক দেরিতেও না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا -اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد—وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون».

“ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁর অনুসরণের জন্য, তোমরা তার সাথে বিরোধ কর না। তিনি যখন আল্লাহু আকবার বলবেন, তখন তোমরা আল্লাহু আকবার বলবে, আর যখন রুকু করবেন, তোমরা রুকু করবে, যখন سمع الله لمن حمده বলবেন, তোমরা اللَّهُمَّ ربنا ولك

[66] মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৪৪।

الحمد বলবে, যখন সেজদা করবেন, তোমরা সেজদা করবে, যখন তিনি বসে নামাজ আদায় করবেন তখন তোমরা সবাই বসে নামাজ আদায় করবে।”[67] ইমামের পূর্বে কোনো কাজ করা হারাম হওয়া সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار».

“যে ব্যক্তি নামাজে ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় তার কি ভয় হয় না যে, আল্লাহ তা‘আলা তার মাথাকে গাধার মাথা বানিয়ে দেবেন কিংবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতি বানিয়ে দেবেন।”[68]

---

[67] বুখারী, ৬৮৯।

[68] বুখারী, ৬৯১।

মাতা-পিতার অধিকার

মাতা-পিতার অনেক অধিকার রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধিকার নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার :

আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ভালো আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন—

﴿ ۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۚ ﴾ [الاسراء: ٢٣]

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।"[৬৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার আনুগত্যকে সর্বোত্তম আমল এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আমলের মাঝে গণ্য করেছেন। সাহাবি ইবনে মাসঊদ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন—

أيّ العمل أحب إلى الله؟ قال «الصلاة على وقتها»، قال ثم أيّ؟ قال «بر الوالدين» قال ثم أيّ؟ قال «الجهاد في سبيل الله».

---

৬৯ আল-ইসরা : ২৩

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বললেন, সময় মত নামাজ পড়া। তিনি বললেন, অতঃপর কোনটি? বললেন, পিতা-মাতার আনুগত্য করা। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।[৭০] পবিত্র কুরআন এবং রাসূলের হাদিস পিতা-মাতার প্রতি সুন্দর আচরণের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ ﴾ [لقمان: ١٥]

এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহ অবস্থান করবে।[৭১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল—

من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال «أمّك» قال ثم من؟ قال «أمّك»، قال ثم من؟ قال «أمّك»، قال ثم من؟ قال «أبوك».

আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তোমার মা। অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার

৭০ বুখারী: ৫৫১৩

৭১ লুকমান : ১৫

মা। তারপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা, তিনি আবারো জিজ্ঞেস করলেন : তারপর কে? রাসূলুল্লাহ বললেন: তোমার পিতা।[৭২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা-পিতার অবাধ্য হতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন এটি কবিরা গোনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:—

«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور...»

আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দেব না? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরিক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। রাসূল এতক্ষণ হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসে বললেন, সাবধান! আর মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া...।[৭৩]

পিতা-মাতার অবাধ্যতা যেমন তাদের উপর রাগ করা, তাদের আনুগত্য না করা, তাদের কথায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, তাদেরকে ধমক দেওয়া, তাদের প্রয়োজন প্রকাশ করলে এবং কোনো কথা বললে উফ বলে বিরক্তি প্রকাশ করা।

---

৭২ বুখারী: ৫৫১৪

৭৩ বুখারী: ৫৫১৯

২. তাদের আনুগত্য করা :

তাদের আদেশ-নিষেধ মানা। কিন্তু তা নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে :

ক) আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ না দেওয়া।

খ) আদেশ মান্য করার উপর সন্তানের সামর্থ্য এবং শক্তি থাকা।

৩. তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলা :

কোনো অবস্থায় চিৎকার-চেচামেচি করা যাবে না। যখন তারা কথা বলবে অথবা কিছু চাইবে তখন উঁহু বলা যাবে না। পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হলে এই অধিকারটির প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হয়। আল্লাহ বলেন—

﴿إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣﴾ [الاسراء: ٢٣]

তাদের মধ্য কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা বরং তাদেরকে শিষ্টচার পূর্ণ কথা বল ।[৭৪]

---

৭৪ আল-ইসরা : ২৩

৪. পিতা-মাতার সাথে নম্র ব্যবহার এবং তাদের সামনে সংযত আচরণ :

কোন বিশেষ জ্ঞান, সম্পদ অথবা কোনো পদ লাভ করার কারণে নিজেকে তাদের থেকে উঁচু মনে না করা। বরং সর্বদা মনে করবে আমি সেই ছোট সন্তান যাকে তারা কোলে তুলে নিত এবং যার ময়লা পরিষ্কার করত এবং যাকে খাওয়াত যখন সে নিজে খেতে পারত না। সে কি করে তাদের উপর বড়ত্বের দাবি করতে পারে? আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

﴿ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ ﴾ [الاسراء: ٢٤]

তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও।[৭৫]

৫. পিতা-মাতার জন্য দো‘আ করা :

সন্তানের কর্তব্য হল তাঁদের জন্য জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর দো‘আ করা। আল্লাহ বলেন—

﴿ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ﴾ [الاسراء: ٢٤]

---

৭৫ আল-ইসরা : ২৪

এবং বল : হে পালনকর্তা! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।[৭৬]

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

মানুষ যখন মারা যায় তিনটি আমল ছাড়া সমস্ত আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। চলমান দান, অথবা উপকারী ইলম, অথবা সৎ সন্তান—যে তার জন্য দো'আ করতে থাকে।[৭৭]

৬. পিতা-মাতাকে অভিশপ্তকরনের কারণ না হওয়া :

কাউকে অভিশাপ দেওয়া এমনিতেই হারাম ও অবৈধ আর এ অবৈধতার মাত্রা আরো বেড়ে যায় যদিএ অভিশাপ প্রদান, পিতা-মাতাকে অভিশপ্ত করণের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه و يسب أمه فيسب أمه».

---

৭৬ আল-ইসরা : ২৪

৭৭ মুসলিম : ৩০৮৪

সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ হল কোনো ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেওয়া। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি কীভাবে নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কারো পিতাকে গালি দিল, আর সে তার পিতাকে গালি দিল। কারো মাতাকে গালি দিল আর সে তার মাকে গালি দিল।[৭৮]

এ যদি হয় অবস্থা তাহলে সে ব্যক্তির অবস্থা কত মারাত্মক, যে সরাসরি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন।

৭. পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন এবং সাথিদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা, আর তাদেরকে সম্মান করা। পিতা-মাতার জীবদ্দশায় এবং তাদের মৃত্যুর পর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«إن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه».

সবচেয়ে বড় সৎকর্ম হল সন্তান তার পিতার বন্ধুর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।[৭৯]

---

৭৮ বুখারী: ৫৫১৬

১ মুসলিম : ৪৬৩১

৮. তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং প্রয়োজনে শিক্ষা দেওয়া:

মানুষের মাঝে পিতা-মাতা সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখে উপদেশ এবং সাহায্য পাওয়ার। তাদের কোনো অন্যায় যে দেখবে, সে নম্রতা ও আদবের সাথে তাদেরকে সাবধান করবে। কেননা এর দ্বারা তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, যখন কোনো সন্তান তার পিতাকে অপছন্দনীয় কোনো কাজে দেখবে, তাকে কঠোরতা এবং খারাপ ব্যবহার ছাড়া বোঝাবে এবং কঠিন ভাষায় কথা বলবে না। নতুবা তিনি সন্তানের কথা শুনবেন না। তার সাথে অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা চলবে না।

তারপরও পিতা সন্তানের উপদেশ কখনও কখনও গ্রহণ না-ও করতে পারেন, সে জন্যে উত্তম হল, পরোক্ষভাবে অন্যের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া। যেমন, মসজিদের ইমামকে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে কথা বলতে অনুরোধ করবে, যার প্রয়োজন তার পিতার রয়েছে। অথবা পিতাকে এমন কিতাবের সন্ধান দেবে, যার মাঝে তার ভুল শুধরে দেবার উপাদান রয়েছে। অথবা বইটি তার সামনে মেলে ধরবে, কিন্তু তাকে সতর্ক করার কথা বুঝতে দেবে না। তাহলে তিনি হয়তো তা পড়া এবং গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। এছাড়া অন্য যে কোনো মাধ্যম অবলম্বন করতে পারে, যার দ্বারা তার উপকার হয়।

কোনো অবস্থায় সরাসরি তাকে উদ্দেশ্য করবে না। কেননা এর দ্বারা হতে পারে তিনি দূরে সরে যাবেন।

৯. তাদের সংগ ও সাহচর্য লাভ করা :

এটা সন্তান এবং পিতা-মাতার মাঝে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্যে কাম্য। এর অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। তার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ক) সর্বদা তাদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা।

খ) তাদেরকে উপহার দেওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تهادوا تحابوا».

তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর, তাতে ভালোবাসা সুদৃঢ় হবে।[৮০]

গ) ভ্রমণে তাদের সঙ্গ দেবে—ইত্যাদি। আর এটা আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশের মাঝে শামিল—

---

৮০ মুয়াত্তা মালেক : ১৪১৩

﴿ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ ﴾ [لقمان: ١٥]

এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহ অবস্থান করবে।[৮১]

১০. কতিপয় জরুরি আদব :

সন্তানের উচিত পিতা-মাতার কাউকে নাম ধরে না ডাকা। তাঁদের বসার পূর্বে না বসা, তাদের সামনে দিয়ে না হাঁটা। তবে যদি তারা সামনে বাড়িয়ে দেয় তাদের কোনো কষ্ট দূর করার জন্য, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই।

তাদের সেবা করবে, তাদের আহবানে সাড়া দেবে, তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। তারা কথা বলার সময় কথা বলবে না, তাদের ভুল ধরবে না অথবা বলবে না আপনি জানেন না। প্রত্যেক শরিয়তসম্মত এবং বৈধ বিষয়ে সর্বদা পিতা-মাতাকে খুশী রাখার চেষ্টা করা উচিত। তারা সন্তানদেরকে নামাজি এবং সৎ হিসাবে ভালোবাসবে এবং সৎ লোকদের সঙ্গী হিসাবে ভালোবাসবে এবং সন্তানের শিক্ষা এবং উপরে উঠার মনোভাবকে ভালোবাসবে। বরং সন্তানকে নিয়ে গর্ববোধ করবে। অতএব, উল্লেখিত গুণাবলি অর্জন করা পিতা-মাতার অনুগত হওয়ার শামিল।

---

৮১ লুকমান : ১৫

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি

অবাধ্য সন্তানের দুনিয়া আখেরাত দুটিই ধ্বংস হয়ে যায়।

১. মাতা-পিতার অবাধ্যতা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ।

২. এতে দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে যায়।

৩. নিজ সন্তানও অনুরূপ অবাধ্য হয়।

৪. সমস্ত কাজে ও নিজ বয়সের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক

আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :—

﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ﴾ [الرعد: ٢١]

এবং যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন।[82]

তিনি নিকট আত্মীয়দের অধিকার আদায়ে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ বলেন :

﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ ﴾ [الاسراء: ٢٦]

"আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর।"[83]

আল্লাহ তা'আলা হাদিসে কুদসীতে 'সম্পর্ক'-কে লক্ষ্য করে বলেন :—

«من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته».

---

[82] সূরা আর-রা'দ: ২১।

[83] সূরা আল-ইসরা: ২৬।

“যে ব্যক্তি তোমাকে ঠিক রাখবে, আমি তাকে মিলিয়ে রাখব আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তাকে ছিন্ন করব।”[84]

আর সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে খুব সর্তক করেছেন এবং একে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি বলে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ ۝٢٢ ﴾ [محمد: ٢٢]

“ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত: তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে ।”[85]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

«لا يدخل الجنة قاطع».

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[86]

---

[84] বুখারী, ৫৯৮৮।

[85] সূরা মুহাম্মাদ: ২২।

[86] বুখারী, ৫৯৮৪।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফযিলত :

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অনেক ফযিলত রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু উল্লেখ করা হল।

1. সম্পর্ক বজায় রাখা রিজিক বৃদ্ধি এবং দীর্ঘজীবী হবার কারণ এবং উভয়ের মাঝে বরকতের কারণ। আনাস রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন—

«من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه».

"যে ব্যক্তি তার রিজিক প্রশস্ত হওয়া এবং মৃত্যুর সময় পিছিয়ে দেওয়া কামনা করে, তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।"[87]

2. এ কাজ জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে। আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তখন রাসূল বললেন—

«تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلوة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم».

---

[87] বুখারী: ৫৫২৭।

“আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কোনো কিছু শরিক করো না। নামাজ ভালো করে আদায় কর এবং যাকাত দাও। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখ।”[88]

3. দুনিয়া এবং আখেরাতে সৌভাগ্য এবং তাওফীক পাওয়ার কারণ হল আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

সম্পর্কের স্তর :

এ সম্পর্ক বজায় রাখার কিছু স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর হল : জান-মাল দ্বারা সাহায্য করা এবং কল্যাণ কামনা করা। আর সর্বনিম্ন স্তর হল, সালাম দেওয়া। এই দুইটির মাঝখানে আরো অনেক স্তর রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«بلوا أرحامكم ولو بالسلام».

সালাম-এর মাধ্যমে হলেও তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ।[89]

[88] বুখারী, ১৩৯৬।

[89] তাবারানী, ৮/১৫২।

আর অপর দিকে এর উঁচু স্তর হল, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها».

"সমান সমান আচরণ দ্বারা সম্পর্ক স্থাপনকারী হওয়া যায় না। কিন্তু, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে, তখনও যদি সে সম্পর্ক ঠিক রাখে, তাহলেই তাকে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপনকারী বলা যাবে।"[90] অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক পূর্ণ বজায় রাখা তখনই হবে, যখন কোনো সম্পর্ক ছিন্ন করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখা হবে।

সম্পর্কের সীমারেখা বা সংজ্ঞা :

আত্মীয়তার সম্পর্কের কোনো নির্দিষ্ট সীমানা বা সংজ্ঞা নেই। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তা নির্ধারিত হয়। প্রচলিত রীতি যেটাকে সম্পর্ক বজায় রাখা মনে করে সেটা ধর্তব্য। আর যেটাকে সম্পর্ক ছিন্ন করা মনে করে সেটা বর্জনীয়।

---

[90] বুখারী, ৫৯৯১।

আত্মীয়তার পার্থক্য ও মর্যাদা অনুযায়ী সম্পর্কের মাঝে পার্থক্য হয়ে থাকে, পিতার সম্পর্ক আর দূর সম্পর্কের চাচাত ভাইয়ের সম্পর্ক এক হয় না।

অবস্থা অনুযায়ী এ সম্পর্কের পার্থক্য ঘটে। রুগী এবং অভাবীর সম্পর্ক সুস্থ এবং ধনীর সমান হয় না। বড়-ছোটর সম্পর্কও এক হয় না। অনুরূপভাবে স্থান অনুযায়ী সম্পর্কের মাঝে পার্থক্য ঘটে। যে দেশের মাঝে আছে আর যে দেশের বাইরে আছে, তাদের সম্পর্ক এক রকম হয় না।

সম্পর্কের নিদর্শন হল পরস্পর সাক্ষাৎ এবং অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া, সালাম দেওয়া, ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা, পত্র লেখা ইত্যাদি।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটি সুদৃঢ় বন্ধন। আল্লাহ তা'আলা এর চির স্থায়িত্ব পছন্দ করেন, বিচ্ছেদ অপছন্দ করেন। আল্লাহ বলেন—

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ۝٢١ ﴾ [النساء: ٢١]

'তোমরা কীভাবে তা (মোহরানা) ফেরত নিবে? অথচ তোমরা পরস্পর শয়ন সঙ্গী হয়েছ। সাথে সাথে তারা তোমাদের থেকে চির বন্ধনের সুদৃঢ় অঙ্গিকারও নিয়েছে।'[৯১]

এ চুক্তিপত্র ও মোহরানার কারণে ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে কতক দায়দায়িত্ব ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। যা বাস্তবায়নের ফলে দাম্পত্য জীবন সুখী ও স্থায়ী হবে—সন্দেহ নেই। সে সব অধিকারের প্রায় সবগুলোই সংক্ষেপ আকারে বর্ণিত হয়েছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে—

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

---

৯১ নিসা : ২০

‘যেমন নারীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমন তাদের জন্যও অধিকার রয়েছে ন্যায্য-যুক্তিসংগত ও নীতি অনুসারে। তবে নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’[৯২]

আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। যদিও আনুগত্য এবং রক্ষনা-বেক্ষন ও অভিভাবকত্বের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের।

এখানে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে বিরাজমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার স্তর ও মানের ভিত্তিতে উল্লেখ করছি।

প্রথমত: যে সব অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সমান। দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সততা, বিশ্বস্ততা ও সদ্ভাব প্রদর্শন করা। যাদের মাঝে নিবিড় বন্ধুত্ব, অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, অধিক মেলামেশা, সবচেয়ে বেশি আদান-প্রদান তারাই স্বামী এবং স্ত্রী। এ সম্পর্কের চিরস্থায়ী রূপ দিতে হলে ভালো চরিত্র, পরস্পর সম্মান, নম্র-ভাব, হাসি-কৌতুক এবং অহরহ ঘটে যাওয়া ভুলচুক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা অবশ্যম্ভাবী। এবং এমন সব কাজ, কথা ও ব্যবহার পরিত্যাগ করা, যা উভয়ের সম্পর্কে চির ধরে কিংবা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন—

---

৯২ বাকারা : ২২৭

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: ١٩]

'তাদের সাথে তোমরা সদ্ভাবে আচরণ কর।'[৯৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي».

'তোমাদের মাঝে যে নিজের পরিবারের কাছে ভাল, সেই সর্বোত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে ভালো।'[৯৪]

পরস্পর সদ্ভাবে জীবন যাপন একটি ব্যাপক শব্দ। এর মাঝে সমস্ত অধিকার বিদ্যমান।

দ্বিতীয়ত: পরস্পর একে অপরকে উপভোগ করা। এর জন্য আনুষঙ্গিক যাবতীয় প্রস্তুতি ও সকল উপকরণ গ্রহণ করা। যেমন সাজগোজ, সুগন্ধি ব্যবহার এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ দুর্গন্ধ ও ময়লা কাপড় পরিহার ইত্যাদি। স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা। অধিকন্তু এগুলো সদ্ভাবে জীবন যাপনেরও অংশ। ইবনে আব্বাস রা. বলেন—

---

৯৩ নিসা : ১৮

৯৪ ইবনে মাজাহ : ১৯৬৭

«إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي».

‘আমি যেমন আমার জন্য স্ত্রীর সাজগোজ কামনা করি, অনুরূপ তার জন্য আমার নিজের সাজগোজও পছন্দ করি।’

তবে পরস্পর এ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উভয়কেই হারাম সম্পর্ক ও নিষিদ্ধ বস্তু হতে বিরত থাকতে হবে।

তৃতীয়ত : বৈবাহিক সম্পর্কের গোপনীয়তা রক্ষা করা। সাংসারিক সমস্যা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা না করাই শ্রেয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উপভোগ্য বিষয়গুলো গোপন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«إنّ من أشرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها».

কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সর্ব-নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং যার সাথে তার স্ত্রী মিলিত হয়, অতঃপর সে এর গোপনীয়তা প্রকাশ করে বেড়ায়।[৯৫]

৯৫ মুসলিম : ২৫৯৭

চতুর্থত : পরস্পর শুভ কামনা করা, সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া। আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করা। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে অপর থেকে উপদেশ পাওয়ার অধিক হকদার। দাম্পত্য জীবন রক্ষা করা উভয়েরই কর্তব্য।আর এর অন্তরভূক্ত হচ্ছে, পরস্পর নিজ আত্মীয়দের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করা ।

সন্তানদের লালন-পালন ও সুশিক্ষার ব্যাপারে উভয়েই সমান, একে অপরের সহযোগী। আল্লাহ তা'আলা বলেন -

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ ﴾ [المائدة: ٢]

'তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা কর।'[৯৬]

দ্বিতীয়ত : স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য। সুখকর দাম্পত্য জীবন, সুশৃঙ্খল পরিবার, পরার্থপরতায় ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন অটুট রাখার স্বার্থে ইসলাম জীবন সঙ্গিনী স্ত্রীর উপর কতিপয় অধিকার আরোপ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হল।

---

৯৬ মায়েদা : ২

1. স্বামীর আনুগত্য : স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। তবে যে কোনো আনুগত্যই নয়, বরং যেসব ক্ষেত্রে আনুগত্যের নিম্ন বর্ণিত তিন শর্ত বিদ্যমান থাকবে।

(ক) ভালো ও সৎ কাজ এবং আল্লাহর বিধান বিরোধী নয় এমন সকল বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।

(খ) স্ত্রীর সাধ্য ও সামর্থ্যের উপযোগী বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্বারোপ করেন না।

(গ) যে নির্দেশ কিংবা চাহিদা পূরণে কোনো ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, সে ব্যাপারে স্বামীর আনুগত্য করা। আনুগত্য আবশ্যক করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

'নারীদের উপর পুরুষগণ শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী।'[৯৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন—

৯৭ বাকারা : ২২৭

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ﴾ [النساء: ٣٤]

‘পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বকারী। কারণ আল্লাহ তা‘আলা-ই তাদের মাঝে তারতম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বিধান রেখেছেন। দ্বিতীয়ত পুরুষরাই ব্যয়-ভার গ্রহণ করে।’[৯৮]

উপরন্তু এ আনুগত্যের দ্বারা বৈবাহিক জীবন স্থায়িত্ব পায়, পরিবার চলে সঠিক পথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর আনুগত্যকে ইবাদতের স্বীকৃতি প্রদান করে বলেন—

«إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أى من أبواب الجنة شاءت».

“যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজান মাসের রোজা রাখে এবং নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করে ও স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করে, সে, নিজের ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে।”[৯৯]

---

৯৮ নিসা : ৩৪

৯৯ আহমাদ : ১৫৭৩

স্বামীর কর্তব্য, এ সকল অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করা। স্ত্রীর মননশীলতা ও পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে সত্য-কল্যাণ ও উত্তম চরিত্রের উপদেশ প্রদান করা কিংবা হিতাহিত বিবেচনায় বারণ করা। উপদেশ প্রদান ও বারণ করার ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ ও উন্নত মননশীলতার পরিচয় দেওয়া। এতে সানন্দ চিত্তে ও স্বাগ্রহে স্ত্রীর আনুগত্য পেয়ে যাবে।

২. স্বামী-আলয়ে অবস্থান:

নেহায়েত প্রয়োজন ব্যতীত ও অনুমতি ছাড়া স্বামীর বাড়ি থেকে বের হওয়া অনুচিত। মহান আল্লাহ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নারীদের ঘরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের সম্বোধন করে বলেন—সকল নারীই এর অন্তর্ভুক্ত—

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ [الاحزاب: ٣٣]

‘তোমরা স্ব স্ব গৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।’[১০০]

১০০ আহযাব : ৩৩

স্ত্রীর উপকার নিহিত এবং যেখানে তারও কোনো ক্ষতি নেই, এ ধরনের কাজে স্বামীর বাধা সৃষ্টি না করা। যেমন পর্দার সাথে, সুগন্ধি ও সৌন্দর্য প্রদর্শন পরিহার করে বাইরে কোথাও যেতে চাইলে বারণ না করা। ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

আল্লাহর বান্দিদেরকে তোমরা আল্লাহর ঘরে যেতে বাধা দিয়ো না।[১০১]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা: এর স্ত্রী যয়নব সাকাফী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলতেন—

«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا».

"তোমাদের কেউ মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছে করলে সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।"[১০২]

2. নিজের ঘর এবং সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখা। স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করা। স্বামীর সাধ্যের অতীত এমন কোনো আবদার

---

১০১ বুখারী: ৮৪৯

১০২ মুসলিম : ৬৭৪

কিংবা প্রয়োজন পেশ না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها».

‘স্ত্রী স্বীয় স্বামীর ঘরের জিম্মাদার। এ জিম্মাদারির ব্যাপারে তাকে জবাবদেহিতার সম্মুখীন করা হবে।’[১০৩]

3. নিজের পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষা করা। পূর্বের কোনো এক আলোচনায় আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস এ মর্মে উল্লেখ করেছি যে, নিজেকে কখনো পরীক্ষা কিংবা ফেতনার সম্মুখীন না করা।

4. স্বামীর অপছন্দনীয় এমন কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া। হোক না সে নিকট আত্মীয় কিংবা আপনজন। যেমন ভাই-বেরাদার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«ولكم عليهن أن لا يؤطئن فرشكم أحداً تكرهونه».

‘তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে বিছানায় জায়গা না দেওয়া স্ত্রীদের কর্তব্য।’[১০৪]

---

১০৩ বুখারী: ২৫৪৬

১০৪ মুসলিম : ২১৩৭

স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোজা না রাখা। কারণ, রোজা নফল—আনুগত্য ফরয। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«لا يحل للمرأة أن تصوم و زوجها شاهد إلا بأذنه، ولا تأذن في بيته إلا باذنه».

নারীর জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া রোজা রাখা বৈধ নয়। অনুরূপ ভাবে অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়াও বৈধ নয়।[১০৫]

তৃতীয়ত : স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য, সুখকর দাম্পত্য জীবন, সুশৃঙ্খল পরিবার, পরার্থপরতায় ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন অটুট রাখার স্বার্থে ইসলাম জীবন সঙ্গী স্বামীর উপর কতিপয় অধিকার আরোপ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হল।

1. দেন মোহর

নারীর দেন মোহর পরিশোধ করা ফরয। এ হক তার নিজের, পিতা-মাতা কিংবা অন্য কারো নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

১০৫ বুখারী : ৪৭৬৯

﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةًۚ ﴾ [النساء: ٤]

'তোমরা প্রফুল্ল চিত্তে স্ত্রীদের মোহরানা দিয়ে দাও।'[১০৬]

2. ভরন পোষণ:

সামর্থ্য ও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীর ভরন-পোষণ করা স্বামীর কর্তব্য। স্বামীর সাধ্য ও স্ত্রীর মর্তবার ভিত্তিতে এ ভরন-পোষণ কম বেশি হতে পারে। অনুরূপভাবে সময় ও স্থান ভেদে এর মাঝে তারতম্য হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ ﴾ [الطلاق: ٧]

বিত্তশালী স্বীয় বিত্তানুযায়ী ব্যয় করবে। আর যে সীমিত সম্পদের মালিক সে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত সম্পদ হতেই ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে পরিমাণ দিয়েছেন, তারচেয়ে' বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে প্রদান করেন না।[১০৭]

3. স্ত্রীর প্রতি স্নেহশীল ও দয়া-পরবশ থাকা। স্ত্রীর প্রতি রূঢ় আচরণ না করা। তার সহনীয় ভুলচুকে ধৈর্যধারণ করা। স্বামী

---

১০৬ নিসা : 8

১০৭ তালাক : ৭

হিসেবে সকলের জানা উচিত, নারীরা মর্যাদার সম্ভাব্য সবকটি আসনে অধিষ্ঠিত হলেও, পরিপূর্ণরূপে সংশোধিত হওয়া সম্ভব নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا ».

তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী। কারণ, তারা পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্ট। পাঁজরের উপরের হাড়টি সবচে' বেশি বাঁকা। তুমি একে সোজা করতে চাইলে, ভেঙে ফেলবে। আবার এ অবস্থায় রেখে দিলে, বাঁকা হয়েই থাকবে। তাই তোমরা তাদের কল্যাণকামী হও, এবং তাদের ব্যাপারে সৎ-উপদেশ গ্রহণ কর।

4. স্ত্রীর ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল হওয়া। হাতে ধরে ধরে তাদেরকে হেফাযত ও সুপথে পরিচালিত করা। কারণ, তারা সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল, স্বামীর যে কোনো উদাসীনতায় নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর ফেতনা হতে খুব যত্ন সহকারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন—

«ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء».

‘আমার অবর্তমানে পুরুষদের জন্য নারীদের চে’ বেশি ক্ষতিকর কোনো ফেতনা রেখে আসিনি।’[১০৮]

নারীদের ব্যাপারে স্বামীদের আত্মসম্মানবোধের প্রতি লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«أتعجبون من غيرة سعد، أنا أغير منه، والله أغير مني».

‘তোমরা সা‘আদ এর আবেগ ও আত্মসম্মানবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ। আমি তার চে’ বেশি আত্মসম্মানবোধ করি, আবার আল্লাহ আমারচে’ বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন।’[১০৯]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, যার মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ নেই সে দাইয়ূছ (অসতী নারীর স্বামী, যে নিজ স্ত্রীর অপকর্ম সহ্য করে)। হাদিসে এসেছে—

«لا يدخل الجنة ديوث».

‘দাইয়ূছ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’[১১০]

---

১০৮ বুখারী:৪৭০৬

১০৯ মুসলিম : ২৭৫৫

১১০ দারামি : ৩৩৯৭

মানুষের সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদার বিষয় নিজের পরিবার। এর ভেতর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্বীয় স্ত্রী। অতঃপর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং অধীনস্থগণ।

পরিশেষে নির্ঘাত বাস্তবতার কথা স্বীকার করে বলতে হয়, কোনো পরিবার সমস্যাহীন কিংবা মতবিরোধ মুক্ত নয়। এটাই মানুষের প্রকৃতি ও মজ্জাগত স্বভাব। এর বিপরীতে কেউ স্বীয় পরিবারকে নিষ্কণ্টক অথবা ঝামেলা মুক্ত কিংবা ফ্রেশ মনে করলে, ভুল করবে। কারণ, এ ধরাতে সর্বোত্তম পরিবার কিংবা সুখী ফ্যামিলির একমাত্র উদাহরণ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার ও ফ্যামিলি। সেখানেও আমরা মানবিক দোষ-ত্রুটির চিত্র দেখতে পাই, অন্য পরিবারের ঝামেলামুক্তির বিষয়টি কোথায়?

জ্ঞানী-গুণীজনের স্বভাব ভেবে-চিন্তে কাজ করা, ত্বরা প্রবণতা পরিহার করা, ক্রোধ ও প্রবৃত্তিকে সংযমশীলতার সাথে মোকাবিলা করা। কারণ, তারা জানে যে কোনো মুহূর্তে ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনায় আত্মমর্যাদার ছদ্মাবরণে মারাত্মক ও কঠিন গুনাহ হয়ে যেতে পারে। যার পরিণতি অনুসূচনা বৈকি? আবার এমনও নয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কল্যাণ ও সুপথ বান্দার নখদর্পে করে

দিয়েছেন। তবে অবশ্যই তাকে মেধা, কৌশল ও বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে।

ইসলামে নারীর অবস্থান

ইসলামে নারীর মর্যাদা, অবস্থান এবং নারীর অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা নিতে হলে ইসলাম পূর্বযুগে নারীর অবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা জরুরি।

ইসলাম পূর্বযুগে নারী

আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়্যত লাভের পূর্বে ধরা-পৃষ্ঠ ছিল মূর্খতা ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রতিটি বিষয় ও স্থানে ছিল বিশৃঙ্খলার জয়জয়কার। আকীদা-বিশ্বাস, অভ্যাস-আচরণ, চরিত্র-মাধুর্য সকল ক্ষেত্রেই ছিল অরাজকতা বিরাজমান। তথাকথিত কতিপয় প্রথা, ব্যক্তি স্বার্থ বৈ এমন কোনো নীতি-আদর্শ বিদ্যমান ছিল না, যার উপর নির্ভরশীল হতে পারে একটি সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা মানব গোষ্ঠী।

যার কিছু নগ্ন চিত্র, বাস্তব প্রতিচ্ছবি: নারীদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণের ভেতরদিয়ে আমাদের গোচরীভূত হয়। দেখতে পাই নারীরা কেমন বেদনাদায়ক পরিবেশে দিনাতিপাত করত। কোনো অধিকার নেই, দায়িত্ব নেই, সামর্থ্যের বাইরে সামান্য প্রাপ্যও নেই। এরই কতিপয় নমুনা আমরা এখানে তুলে ধরছি।

(ক) জন্মের পর থেকেই নারী অপয়া। জন্মের পূর্বে পিতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত, বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকত, পুত্র সন্তানের আগমনে কীভাবে আনন্দ করবে, কোনো ধরনের উৎসবের আয়োজন করবে ইত্যাদি বিষয়ে। হঠাৎ কন্যা সন্তানের সংবাদ শুনলে মাথা নত হয়ে যেত। মন সংকীর্ণ হয়ে আসতো। বিবর্ণ হয়ে যেত চেহারা। অন্ধকার মনে হত সূর্যালোকিত এ পৃথিবী। অপমান আর লজ্জার গ্লানিতে লোকালয় পরিত্যাগ করত।

(খ) কেউ কেউ কন্যাসন্তান জনিত গ্লানি মুছতে জীবিত দাফন করে দিত তাকে। আবার বাঁচিয়ে রাখলেও অপমান আর লাঞ্ছনার সাথে। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা যার উল্লেখ করছেন পবিত্র কুরআনে। তিনি বলেন-

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ٥٩ ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩]

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের শুভসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন সাথে সাথে তার মুখাবয়ব কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। প্রাপ্ত অশুভ সংবাদ শুনে স্বজাতি হতে মাথা লুকিয়ে নেয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় স্বীয় সিদ্ধান্তের

ব্যাপারেতকি করবে একে নিয়ে। অপমানসহ বাঁচিয়ে রাখবে, না মাটির নীচে পূতে ফেলবে। জেনে নাও, তারা নেহায়েত নির্মম, নিষ্ঠুর ও অসুন্দর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১১১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩ ﴾ [التكوير: ٨، ٩]

'স্মরণ কর, যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল?'[১১২]

(গ) নারীর অর্থনৈতিক অধিকার? সেও ছিল তথৈবচ। উত্তরাধিকার বলতে কোনো জিনিসই ছিল না তাদের ক্ষেত্রে।ব্যাপারটি এপর্যন্ত সীমিত থাকলে কথা ছিল কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল আরো অমানবিক আরো করুন,স্বামীর মৃত্যুর পর তাকেই বরং উত্তরাধিকার ও ভোগ্যপণ্য গণ্য করা হত ।

(ঘ) নারী যখন জায়া তখন সে কি তার দাম্পত্য অধিকার নিয়ে ভাবার প্রয়াস পেত? এ চিন্তা ছিল কল্পনারও অতীত কারণ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ছিল উত্তরাধিকার, স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তান অথবা

---

১১১ নাহাল : ৫৯

১১২ তাকওয়ীর : ৮

কোনো নিকট আত্মীয় তাকে উত্তরাধিকার হিসেবে নিয়ে নিত, যার ইচ্ছা বিয়ে করত আবার কেউ এমনিই আবদ্ধ করে রেখে দিত। অন্যত্র বিবাহের কোনো কল্পনা করাও ছিল নিষিদ্ধ। বরং বাধার সৃষ্টি করত অন্যত্র বিবাহ করতে। শান্তির ধর্ম ইসলাম এসে তাদের এ অবস্থা হতে মুক্ত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٩]

হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমাদের প্রদত্ত কিয়দংশ সম্পদ নিয়ে যাবে বলে, তাদের আবদ্ধ করে রেখো না।[১১৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢ ﴾ [النساء: ٢٢]

যে সকল নারীদের তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে, তোমরা তাদের বিবাহ করো না। তবে অতীত তো অতীতই। এটা অশ্লীল, শাস্তিযোগ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।[১১৪]

১১৩ নিসা : ১৯

(ঙ) শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং এ জাতীয় বিষয় নিয়ে নারীরা চিন্তাও করত না। তাদের ক্ষেত্রে এগুলো ছিল কল্পনা বিলাস। নারী সে সময়ে! জীবন্ত প্রোথিত হত শৈশবে, নাহয় -বেচে থাকলে- লাঞ্ছনার জীবন ও পণ্যত্ব বরণ। তার কোনো অধিকারই স্বীকৃত ছিল না। তাহলে ঐ নারী কেমন জীবন যাপন করত?!

ইসলামে নারী

নারীর এ হীনতর অবস্থায় ইসলাম জীবন তরী হয়ে আগমন করল। টেনে তুলল ক্লান্ত-হাবুডুবুরত নারীকে বিস্তৃত-গহিন সমুদ্র হতে। উপহার দিল সুখকর স্বাচ্ছন্দ্যময় একটি বর্নীল-কাংখিত জীবন। যেখানে রয়েছে শিশু-কিশোরীদের স্নেহ-মমতা-আদর আর আদর। সাবালকত্বে রয়েছে পছন্দ-অপছন্দের সব অধিকার। পূর্ণ বয়স্কাদের জন্য আছে বোনের মর্যাদা কিংবা স্ত্রীর সম্মান। অতঃপর পরম শ্রদ্ধার্হ একজন মা।

নারীর ন্যায্য-যোগ্য-প্রাপ্য সব অধিকারই প্রদান করল ইসলাম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল অধিকার নিশ্চিতও করল। এমনকি মৃত্যুর পরও। নিম্নে তার সামান্য চিত্র প্রদত্ত হল।

---

১১৪ নিসা : ২২

(ক) আল্লাহ তা'আলা মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন সাথে সাথে তার আনুগত্য-ইবাদতের দায়িত্বও অর্পণ করেছেন। বিধান রেখেছেন জবাবদিহিতারও। নারী-পুরুষ সকলেই সমান। শিষ্টের লালন-দুষ্টের দমন, ভালোর প্রতিদান এবং মন্দের শাস্তির বিধানও রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ ﴾ [النساء: ١٢٣، ١٢٤]

'যে মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ ছাড়া সে কোনো বন্ধু কিংবা সাহায্যকারীরও সন্ধান পাবে না। পুরুষ কিংবা নারী যে কেউ ঈমান এনে সৎকর্ম করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা তিল পরিমাণও প্রাপ্য হতে বঞ্চিত হবে না।'

(খ) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। সে জ্ঞান ও হিকমতের ভিত্তিতে কতক জিনিসের ভেতর আলাদা বিশেষত্ব প্রদান করেছেন। যা তার দায়িত্ব ও কাজ-কর্মে বিকশিত হয়। তেমনি কতক বিশেষত্বের অধিকারী নারী। যেমন কোমলতা, নমনীয়তা ও দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীলতা। এগুলো তাদের সৃষ্টিগত স্বভাব।

এর ভিত্তিতেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন করেছে মানুষের স্বভাব অনুযায়ী প্রদত্ত দীন ইসলাম। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্টের সাথে সঙ্গতি রেখেই দায়িত্ব দিয়েছেন, এমন কোনো দায়িত্ব দেননি যা তার সাধ্যের বাইরে। আর পুরুষকে নারীর উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়েছেন,তার দায়িত্বের চাহিদা ও ঐ বৈশিষ্টের কারণে যা তাকে আলাদা স্বাতন্ত্র দিয়েছে। আল্লাহই সুউচ্চ কৌশলের মালিক ।

(গ) মেয়েদেরকে ছোট অবস্থায় আদরের সাথে লালন পালন করার প্রতিদান অধিক।

ইমাম মুসলিম র. আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত ভালভাবে লালন-পালন করল, কেয়ামতের দিন সে আর আমি একত্রে আসব। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল স. আঙুল একত্রে মিলিয়ে দেখালেন।

(ঘ) ইসলাম নারীদেরকে ছোট অবস্থা থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা, উত্তম চরিত্র, পবিত্রতা, চরিত্র রক্ষা... শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার পথ দেখিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم فى المضاجع».

তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে উপনীত হলে নামাযের আদেশ কর আর দশ বছর হয়ে গেলে তার জন্যে শাস্তি প্রয়োগ কর এবং বিছানা আলাদা করে দাও।[১১৫]

(ঙ) নারীকে স্বামীর সাথে জীবন যাপন করতে হবে এদিকের গুরুত্ব বিবেচনা করে ইসলাম আদেশ দিয়েছে যে ইতোপূর্বে যারা তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে এদের মধ্যে কাকে তার জন্যে নির্বাচন করা যায় এবিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করতে হবে। সাথে সাথে কোন কোন গুণের বিবেচনায় পাত্র নির্বাচন করা হবে তারও একটি দিকনির্দেশনা দিয়েছে। যেমন দ্বীনদারী এবং ভালো চরিত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» .

যখন তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে এমন লোক যার দ্বীন এবং চরিত্র নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তার সাথে বিবাহ

১১৫ আবু দাউদ : ৪১৮

দিয়ে দাও। এবং ব্যতিক্রম করলে পৃথিবীতে অশান্তি এবং অধিক বিশৃঙ্খলা হবে।[১১৬]

(চ) আল্লাহ তা‘আলা স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তার যত্ন নেওয়া এবং সুন্দরভাবে দেখা-শোনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«خياركم خياركم لأهله، وأنا خياركم لأهلي».

তোমাদের সর্বোত্তম সে যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।[১১৭]

আল্লাহর রাসূল আরো বলেন—

«استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج».

তোমরা নারীর ব্যাপারে কল্যাণ কামী হও। কেননা, নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের বক্র হাড় থেকে।[১১৮]

---

১১৬ ইবনে মাজাহ : ১৯৫৭

১১৭ ইবনে মাজাহ : ১৯৬৭

১১৮ মুসলিম : ২৬৭১

(ছ) নারী মা, এদিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ইসলাম তার জন্যে এমন কিছু অধিকার নিশ্চিত করেছে যে সম্পর্কে প্রাচীন বা আধুনিক মানব রচিত কোনো বিধানই কখনো চিন্তা করেনি।

তার সম্মানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের অধিকারের পর মাতা-পিতার অধিকারকে স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ ۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤ ﴾ [الاسراء: ٢٣، ٢٤]

আপনার পালনকর্তা আদেশ করছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মাঝে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের কে উফ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। এবং বল তাদেরকে শিষ্টচার পূর্ণ কথা। তাদের সামনে নম্রতার সাথে মাথা পেতে দাও। এবং বল হে পালনকর্তা! তাঁদের

উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে।[১১৯]

মুসলিম নারীর বৈশিষ্ট্য:

ইসলাম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে, দান করেছে তাদের এমন বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে তাদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সেগুলো সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছে। সে বৈশিষ্টাবলীর কিছু নিম্নে প্রদান করা হল:

ক) নারীকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে যে, নারীরা তাদের সমস্ত শরীর অপরিচিত পুরুষ হতে ঢেকে রাখবে, যাতে করে তাকে গোপন তীর আঘাত করতে না পারে এবং তার চরিত্র ও পবিত্রতা কালিমা যুক্ত না হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩ ﴾ [الاحزاب: ٥٩]

১১৯ আল-ইসরা : ২২

‘হে নবী! আপনি আপনার পত্নী, কন্যা এবং মুমিনদের স্ত্রী-গণ কে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ [১২০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন-

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَاۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ﴾ [النور: ٣١]

‘আর ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং যৌনাঙ্গের হেফাযত করে।আর সাধারণত: যা প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে। এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ-দেশে ফেলে রাখে।’ [১২১]

খ) ইসলাম পুরুষকে রক্তের সম্পর্কবিহীন নারীর সাথে একাকিত্বে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করেছে, যদিও সে নিকট আত্মীয় হয়। যেমন চাচাত ভাই, মামাত ভাই, দেবর ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

১২০ আল-আহযাব : ৫৯

১২১ নূর : ৩১

«إياكم والدخول على النساء».

‘মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা থেকে সাবধান!’[১২২]

আনসারদের একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি দেবরের কথা বলছেন? রাসূলহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

«الحمو الموت».

দেবর হল মৃত্যু সমতুল্য।[১২৩]

গ) নারীর স্থান তার ঘরে। ঘরই তার কাজের ময়দান। ঘরই তার দায়বদ্ধতার জায়গা, সেখানে তার দৃষ্টির হেফাযত হবে। সন্তানদেরকে লালন-পালন করবে। নিজ স্বামীর বিষয়াদি দেখবে। সহীহ হাদীসে এসেছে—

«كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ...... والمرأة فى بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم فى مال سيده راع و مسؤول عن رعيته».

---

122 তিরমিযী : ১০৯১

১২৩ বুখারী: ৪৮৩১

'তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, প্রত্যেককে তার অধিনস্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। ইমাম দায়িত্বশীল এবং তাকে তার অধিনস্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। ....নারী তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। সেবক তার মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।'[১২৪]

এবং আল্লাহ বলেন-

﴿ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ ﴾ [الاحزاب: ٣٣]

'আর তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতার যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।[১২৫]

এর অর্থ এই নয় যে, নারীদের জন্য কোনো কর্মই বৈধ নয় বরং তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে সম্ভ্রম বজায় রেখে কাজ করাতে কোনো দোষ নেই। যেমন মেয়েদের শিক্ষকতা করা, তাদের চিকিৎসা করা এবং সামাজিকভাবে তাদের দেখাশোনা করা। এবং শরীয়তের নিয়মের ভিতরে থেকে এ জাতীয় যা করা যায়।

---

১২৪ বুখারী: ২৩৮৯

১২৫ আল-আহযাব : ৩৩

ঘ) নিজের ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট আদব রক্ষা করে বের হবে। যেমন পর্দা রক্ষা করা, শরীর ভালভাবে ঢেকে নেয়া, গাম্ভির্য রক্ষা করা ইত্যাদি। প্রয়োজন ছাড়া বের হবে না, সুগন্ধি লাগিয়ে সাজসজ্জা করে বের হবে না।

আবু দাউদ শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

«إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا»

'নারী যখন সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো জনসমক্ষের পাশ দিয়ে যায়; যাতে তারা তার সুগন্ধ পায়, তবে সে মহিলা এমন এমন। (খুব কঠিন কথা বলেছেন। অর্থাৎ ব্যভিচারিণী।[126]

আর এই সতর্কতা এই জন্যে যে, শয়তান যেন তার কিংবা পুরুষদের অন্তরে প্রবেশ করতে না পারে।

ঙ) বেগানা পুরুষের সাথে অতি প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা না বলা, যদি কিছু বলার প্রয়োজন হয় তাহলে যথাযথ আদব ও সম্মানের সাথে নম্র ও কোমলতা ছাড়া কথা বলবে। আল্লাহ বলেন-

---

[126] আবু দাউদ, ৪১৭৩।

﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢ ﴾ [الاحزاب: ٣٢]

নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। ফলে সেই ব্যক্তি যার অন্তরে ব্যাধি আছে কু-বাসনা করে বসবে এবং তোমরা সংগত কথা বলবে।[১২৭]

নারী-পুরুষের অবাধে মেলামেশার ক্ষতি

মুসলিম নারীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের ক্ষতি সাধন করার জন্য যতগুলি মাধ্যম আছে, তার মাঝে সবচেয়ে ক্ষতিকর মাধ্যম হল, পর-পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশা করা। বিশেষ করে নির্জনে মেলামেশা করা। বর্তমান যুগে অমুসলিম নারীরা অবাধ মেলামেশার এই ফাসাদে এমনভাবে পতিত হয়েছে যে মানুষ নামের নেকড়ের সামনে এরা সস্তা পণ্যে পরিণত হয়েছে। মানব জাতির সম্মানকে কর্দমাক্ত করে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রচার মাধ্যম হিসাবে নিজেদের প্রচার করছে। নিজের পবিত্রতাকে শিল্পকারখানার ধুয়া

---

১২৭ আল-আহযাব : ৩২

দ্বারা কলুষিত করেছে। এমনকি নিজের চরিত্রকে পয়সার বিনিময়ে বিলিয়ে দিয়েছে।

এই হল অমুসলিম নারীর সংক্ষিপ্ত অবস্থা। এর মূল কারণ হল আল্লাহর নিয়ম পদ্ধতি থেকে দূরে থাকা এবং পর-পুরুষের সাথে কর্মস্থলে, কারখানায়, দোকানে মেলামেশা করা। সংক্ষেপে অবাধে মেলামেশা অপকার এবং ক্ষতি এভাবে নিরূপণ করতে পারি।

ক) আল্লাহ তা'আলার বেধে দেওয়া পথ ও পন্থা হতে বের হয়ে আসা। কারণ মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজস্ব প্রজ্ঞানুযায়ী মানুষদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট দিয়ে নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ বাইরে কাজ করবে ও নারী অন্দরে। এখন যদি নারী পুরুষ অবাধে মেলামেশা শুরু করে তাহলে প্রত্যেককে এমন দায়িত্ব মাথায় নিতে হবে যা মূলত তার ক্ষমতার বাইরে। আর এতে করে জীবনের গতি-শৃংখলাই ব্যহত হবে ।

খ) এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নারী পুরুষ অবাধে মেলামেশার দ্বারা যৌবনের তপ্ত বাসনা জাগ্রত হয়। খারাপ কামনার আগুনকে বাড়িয়ে দেয়। একে অন্যকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে, তখন পাশবিকতার লাগাম এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে তার

কোনো পরিসীমা থাকে না। তখন দুজনই কামনা বাসনা পূরণ করার কাজে বন্দি হয়ে যায়।

গ) মানুষ যখনই অবৈধভাবে যৌন বাসনা পুরা করার পিছনে পড়ে যায়, তখন তার চিন্তাশক্তি এবং বুদ্ধিলোপ পায় এবং ভালো গুণাবলি ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন ধৈর্য, সহনশীলতা ইত্যাদি।

ঘ) অবাধে মেলামেশা নারী-পুরুষকে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের দিকে নিয়ে যায়। আর এর থেকে সৃষ্টি হয় কঠিন রোগ এইডস, যার কোনো চিকিৎসা নেই।

ঙ) মানুষ তার কামনার পিছনে দৌড়ালে, যা সাধারণত: নারী-পুরুষের অবাধে মেলামেশার দ্বারা সৃষ্টি হয়, সমাজ তখন অনৈতিক আনন্দ-ফুর্তি, খেলাধুলা এবং অহেতুক কাজের সমাজ হয়ে যায়।

চ) স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিরোধ এবং তালাকের প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। কেননা প্রত্যেকে অন্যত্র তার যৌন চাহিদা পূরণ করতে পারে। এতে কারো কোনো দুঃখ ও মনস্তাপ হয়না কারণ প্রত্যেকেরইতো বিকল্প হিসাবে বন্ধু বান্ধবী আছে ।

ছ) অধিক হারে জারজ সন্তান জন্ম নেয় এবং সমাজে এর খারাপ প্রভাব পড়ে।

জ) পারিবারিক বন্ধন নষ্ট হয়ে যায়, সন্তানের ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যায়, তাদেরকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করা যায় না। তাদের প্রতি কর্তব্যগুলি সঠিকভাবে পালন করা হয় না।

সবশেষে মহান রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করি যিনি মুসলিমদেরকে সুন্দর পথ প্রদর্শন করেছেন, যে পথে মান-সম্মান, ধর্ম, চরিত্র, বংশ মর্যাদা, সমস্ত কিছু রক্ষা হয় এবং জীবনের সকল ক্ষেত্র সহজ-সরল হয়।

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশী মূলত বাড়ির আশে পাশে বসবাসকারীকে বলা হয়। কখনও কখনও সফর অথবা কাজের সঙ্গীকে ও প্রতিবেশী বলা হয়। প্রতিবেশীই হচ্ছে মানুষের সবচে নিকট জন, যিনি তার খবরা-খবর সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় বেশি জানেন। ইসলামী শরীয়ত প্রতিবেশীর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং তার অধিকারকে খুব বড় করে দেখেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ ۞وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦ ﴾ [النساء: ٣٦]

উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং সদয় ব্যবহার কর নিকটাত্মীয়, এতীম- মিসকীন, এবং আত্মীয়-সম্পর্কীয় প্রতিবেশী, আত্মীয়তা বিহীন প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী সহচরদের সাথে, এবং অসহায় মুসাফিরের সাথে ।[১২৮]

---

১২৮ নিসা : ৩৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

«مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت إنه سيورثه» .

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অনবরত অসীয়ত করছিলেন,যে এক পর্যায়ে আমার ধারণা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা‘আলা প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী করে দিবেন।[১২৯]

শরীয়ত প্রতিবেশীকে এত অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণ সম্ভবত এই হতে পারে।

(১) যাতে করে মুসলিমদের মাঝে ভালোবাসা এবং মমত্ববোধের প্রসার ঘটে, এর জন্য সর্বোত্তম মানুষ হল প্রতিবেশী।

(২) প্রতিবেশী সকলের চেয়ে অধিক সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার দাবী রাখে, কারণ প্রতিবেশীই তার অতি নিকটে বসবাস করে এবং সে তার যাবতীয় সমস্যা ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি জানে।

(৩) যাতে মুসলিমের নিজ জীবন, সন্তান, পরিবার এবং সম্পদের নিরাপত্তা লাভ হয় ।

---

১২৯ বুখারী: ৫৫৫৫

প্রতিবেশী কারা? যাদের সম্পর্কে কুরআন হাদিসে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে, সেটি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে উলামাদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ বলেছেন: প্রতিবেশীর সীমানা হল, চতুর্দিক দিয়ে চল্লিশ ঘর, কেউ বলেন: যে তোমার সাথে ফজর পড়ল সেই তোমার প্রতিবেশী, ইত্যাদি। আর এই সমস্ত কথার মনে হয় কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতামত হচ্ছে —প্রতিবেশী সে-ই, তার বাড়ির কাছাকাছি যার বাড়ি এবং যার বাড়ির সাথে তার বাড়ি মেলানো। সীমানা নির্ধারিত হবে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী, যে ব্যক্তি মানুষের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রতিবেশী, সেই প্রতিবেশী। আর এটা এই জন্য যে, শরীয়ত যে সমস্ত নামের উল্লেখ করেছে এবং তার অর্থ নির্ধারণ করে দেয়নি, তার অর্থ জানার জন্য সঠিক প্রচলিত রীতির দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

প্রতিবেশীর গুরুত্বের ভিন্নতা আসবে নিকটবর্তী এবং দূরবতী প্রতিবেশী হওয়ার দিক বিবেচনায়। নিকটবর্তী প্রতিবেশী কল্যাণ এবং সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে দূরবর্তী প্রতিবেশীর চেয়ে অধিক গুরুত্ব পাবে, এর প্রমাণ হল: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রশ্ন করেছিলেন—

فقالت : إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: «إلي أقربهما منك باباً».

তিনি বলেন : আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্য থেকে কাকে আমি উপঢৌকন দেব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমার দরজার অধিক নিকটবর্তী জনকে।[১৩০]

তাদের শ্রেণী ও মর্যাদার বিভিন্নতার কারণেও গুরুত্বে ভিন্নতা আসবে:

(1) এক ধরনের প্রতিবেশী আছে যার অধিকার হচ্ছে তিনটি, তিনি হলেন নিকটাত্মীয়-মুসলিম প্রতিবেশী। তার অধিকার তিনটি হচ্ছে: আত্মীয়তা, ইসলাম এবং প্রতিবেশিত্ব।

(2) আরেক প্রকার প্রতিবেশী যার অধিকার দুইটি: তিনি হলেন অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী, তার অধিকার দু'টি হচ্ছে: প্রতিবেশিত্ব ও ইসলাম ।

(3) আর এক ধরনের প্রতিবেশী, যার অধিকার মাত্র একটি, তিনি হলেন অমুসলিম প্রতিবেশী, তার অধিকার শুধু প্রতিবেশিত্বের।

প্রতিবেশী নির্বাচনের গুরুত্ব :

মুসলিমের কর্তব্য হল সব সময় সৎ প্রতিবেশী বেছে নেয়ার দিকে দৃষ্টি দেবে, যে তার অধিকারগুলো আদায় করবে এবং তাকে

---

১৩০ বুখারী: ২০৯৯

কষ্ট দেবে না, তার হেফাযত করবে এবং তাকে সব কাজে সাহায্য করবে, মানুষ বলে (اختر الجار قبل الدار) বাড়ি বানানোর পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচন করা, প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিক জিনিস। এর সপক্ষে পবিত্র কুরআনে কারীমের ঐ আয়াত পেশ করা যেতে পারে, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা ফেরআউনের স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন:—

﴿ رَبِّ ٱبۡنِ لِي عِندَكَ بَيۡتٗا فِي ٱلۡجَنَّةِ ﴾ [التحريم: ١١]

“হে আমার পালনকর্তা, আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন।” [১৩১]

সঠিক প্রতিবেশী নির্বাচন করার গুরুত্ব একথা জানা থাকার মাধ্যমেও স্পষ্ট হয় যে, প্রতিবেশী তার প্রতিবেশী এবং সন্তানদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে, পরস্পর মেলা-মেশার কারণে, সে যদি সৎ হয়, তা হলে প্রতিবেশী তার ঘর এবং পরিবারের ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে যায়। আর যদি অসৎ হয়, তাহলে সে নিরাপদ হতে পারে না।

ভালো প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর গোপন বিষয় অবহিত হলে গোপন রাখে। অসৎ প্রতিবেশী বরং সেটিকে প্রকাশ এবং প্রচার করে বেড়ায়। ভালো প্রতিবেশী ভালো কাজে সাহায্য করে, তাকে সৎ

---

১৩১ তাহরিম : ১১

উপদেশ দেয়। অসৎ প্রতিবেশী ধোঁকা দিয়ে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে।

প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ :

প্রতিবেশীর অনেক অধিকার রয়েছে তার মধ্য থেকে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল।

(১) তাকে কষ্ট না দেওয়া :

হোক সে কষ্ট কথার মাধ্যমে, যেমন অভিশাপ দেওয়া, গালী দেওয়া, তার গীবত করা, এমন কিছু তার সম্পর্কে বলা যার দ্বারা সে কষ্ট পায়, ইত্যাদি।

অথবা কাজের মাধ্যমে : যেমন তার বাড়ির সামনে আবর্জনা ফেলা, তাকে বিরক্ত করা, ছেলে-মেয়েদেরকে তার ঘরের জিনিস নষ্ট করতে উদ্বুদ্ধ করা বা বাধা না দেওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

«والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن» قيل : من يا رســـول الله؟ قال: «والذي لا يأمن جاره بوائقه».

“আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, বলা হল কে সে হে আল্লাহর রাসূল?

তিনি বললেন :ঐ ব্যক্তি যার কষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।[১৩২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

«لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه».

"সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার কষ্ট থেকে মুক্ত নয়।"[১৩৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলছেন :—

«من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره».

"যে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[১৩৪]

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার সবচেয়ে কঠিন প্রকার হল : তার সম্মান-সম্ভ্রম-এ আঘাত আসে এমন বিষয়ে কষ্ট দেওয়া, যেমন প্রতিবেশীর স্ত্রী বা পর্দা করার মত কারও খিয়ানত করা, দৃষ্টি

---

১৩২ বুখারী : ৫৫৫৭

১৩৩ আহমাদ : ৫৮০০

১৩৪ বুখারী: ৫৫৫৯

দেওয়ার মাধ্যমে হোক বা সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে ফোনে কথা বলার মাধ্যমে, অথবা যে কোনো অশ্লীল কাজের মাধ্যমে ।

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : ســألت النبي صلي الله عليه وسلم: أي الذنب عندالله أكبر؟ قال:« أن تجعل لله ندًا وهو خلقك». قلت : ثم أيّ؟ قال «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت : ثم أيٌّ؟ قال «أن تزاني بحليلة جارك».

অর্থাৎ : আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চেয়েছি: আল্লাহ তা'আলার নিকট সব চেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন— কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধরণ করা অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি বললাম তার পরে কি? বললেন: তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করা তোমার সাথে খাওয়ার ভয়ে। আমি বললাম এর পর কি? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে সম্মতির ভিত্তিতে ব্যভিচার করা। অর্থাৎ তার প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ফুসলিয়ে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে তার সাথে ব্যভিচার করা।[১৩৫]

---

১৩৫ বুখারী: ৫৫৪৩

وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره».

“মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন: কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা দশ জন মহিলার সাথে ব্যভিচার করা থেকেও কঠিন পাপ।” [১৩৬]

প্রতিবেশীর এ বিষয়টি বড় করে দেখার কারণ :

(ক) এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর নিকট আমানতস্বরূপ, এর সাথে ব্যভিচার করা উক্ত আমানতের খিয়ানত।

(খ) প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর যাবতীয় অবস্থা এবং তার উপস্থিতি- অনুপস্থিতির সময় সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা।

(গ) সে যেহেতু তার নিকটেই থাকে এবং তার সাথে উঠা-বসা করে তাই তার কষ্ট প্রতিবেশীর নিকট খুব দ্রুত এবং সহজেই পৌঁছে।

---

১৩৬ আহমাদ : ২২৭৩৪

(ঘ) আরেকটি কারণ হচ্ছে কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। আর তা থেকেই অন্যায়ের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে।

প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা :

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره».

অর্থাৎ : যে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।

আর এটি ব্যাপক ভিত্তিক অধিকার, এর সাথে অনেকগুলো অধিকার এবং বিষয় জড়িত।

(ক) তার প্রয়োজনে সাহায্য করা, ব্যবহারের জিনিস চাইলে দেওয়া। কেননা প্রতিবেশী কখনও প্রতিবেশীর কাছে মুখাপেক্ষী নয় এমন হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদের নিন্দা করেছেন যারা নিত্য ব্যবহার্য জিনিস চাইলে বিমুখ করে। তাদের নিন্দা করে আল্লাহ বলেন :

﴿ وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ۝٧ ﴾ [الماعون: ٧]

তারা নিত্য ব্যবহার্য জিনিস অন্যকে দেয় না।[১৩৭]

(খ) প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেওয়া। তার বাড়িতে খাবার ইত্যাদি প্রেরণ করা।

আবু যব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অসীয়ত করেছেন :

«إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف».

অর্থাৎ, যখন তুমি তরকারী রান্না করবে তাতে বেশি করে পানি দেবে অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর খবর নিয়ে তার থেকে তাদেরকে কিছু দেবে।[১৩৮]

(গ) প্রতিবেশী ঋণ চাইলে তাকে ঋণ দেওয়া, তার প্রয়োজনে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে তার রক্ষনাবেক্ষণ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

«ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع»

---

১৩৭ আল-মাউন : ৭

১৩৮ মুসলিম : ৪৭৫৯

অর্থাৎ: সে মুমিন নয় যে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।

(ঘ) প্রতিবেশীর ভালো কোনো সংবাদ পেলে তাকে মোবারকবাদ জানানো এবং খুশি প্রকাশ করা, বিবাহ করলে অথবা সন্তান জন্ম নিলে, অথবা তার সন্তান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এবং এ জাতীয় উপলক্ষে তাকে মোবারকবাদ জানানো এবং বরকতের দো‘আ করা।

(ঙ) মুসলিমদের মাঝে পরস্পরে যে অধিকারগুলো আছে সেগুলো প্রতিবেশীর ব্যাপারে আদায় করবে। কেননা সে-ই এর অধিকার বেশি রাখে, যেমন তাকে সালাম দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থ হলে তার সুশ্রুষা করা, তার দাওয়াত গ্রহণ করা। তার সাথে সাক্ষাৎ হলে আল্লাহর প্রদত্ব ফরযগুলি সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেওয়া—ইত্যাদি।

ইসলামে অভিবাদন পদ্ধতি ও সালামের বিধান

অভিবাধনকে আরবীতে ‘আত্ তাহিয়্যাহ’ বলা হয়, যার আভিধানিক অর্থ, হায়াতের জন্য দো‘আ করা—যেমন বলা হয়—حيّاك الله অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুক। অতঃপর তাহিয়্যাহ শব্দটি ব্যাপক ভাবে প্রত্যেক ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় যা মানুষ দোআর জন্য ব্যবহার হয়।

তাহিয়্যাহ সালাম থেকে ব্যাপক। তাহিয়্যাহর অনেকগুলি পদ্ধতির একটি হচ্ছে সালাম।

আল্লাহ এবং তার রাসূল আমাদের জন্য অভিবাদন জানানোর এমন একটি পদ্ধতি অনুমোদন ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা আমাদেরকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে দেয় এবং যা করলে আমাদের জন্য সাওয়াব লেখা হয়। বরং সেটিকে এক মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অপর মুসলিম ভাইয়ের অধিকার বানিয়ে দিয়েছেন। এই অভিবাদন পদ্ধতিটি নিছক অভ্যাস থেকে একটি এমন আমলে পরিবর্তিত হয়েছে যা বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং রাসূলের নির্দেশ পালনার্থে করে। তাই এই মহান বরকতময় অভিবাদনকে পরিবর্তন করে অন্য কোনো সমঅর্থপূর্ণ শব্দাবলী দ্বারা অভিবাদন জানানো মুসলিমের জন্য কোনভাবেই শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে

না। যেমন সু-প্রভাত, শুভ সন্ধ্যা, স্বাগতম—ইত্যাদি। ইসলামের বরকতপূর্ণ অভিবাদন দ্বারা যা আদায় হয় অন্য কিছু দ্বারা তা আদায় হবে না। অনেকে না জেনে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে ইসলামের নির্ধারিত পদ্ধতির অভিবাদন বাদ দিয়ে উপরোক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকে যা কোনো ভাবেই ঠিক নয়।

ইসলামের অভিবাদন হলো :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

এটিই হল অভিবাদনের পরিপূর্ণরূপ। আর ন্যূনতম রূপ হচ্ছে

السّـــلام عليكم

ইসলামের এই অভিবাদনের অনেক ফযিলত রয়েছে।

১। এটি ইসলামের উত্তম জিনিসের মধ্য থেকে একটি—হাদীসে এসেছে

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً ســـأل رســول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال «إطعام الطعام وتقرأ السلام علي من عرفت ومن لم تعرف».

অর্থাৎ : আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করলেন ইসলামের কোনো কাজটি সবচে ভাল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: খাবার খাওয়ানো এবং সালাম দেওয়া পরিচিত-অপরিচিত সকলকে।[১৩৯]

২। সালাম মুসলিমদের মাঝে ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السّلام بينكم».

অর্থাৎ : তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর ঈমানদার হতে পারবে না পরস্পরে ভালোবাসা না হলে, তোমাদেরকে কি এমন একটি বিষয়ের কথা বলে দেব না, যা করলে তোমাদের পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা পরস্পরের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও।[১৪০]

---

১৩৯ বুখারী: ২৭

১৪০ মুসলিম : ৮১

৩। সালামের প্রত্যেক বাক্যে দশ নেকী, সালামে মোট তিনটি বাক্য আছে, সুতরাং যে পূর্ণ সালাম দেবে তার ত্রিশটি নেকী অর্জন হবে।

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم فرد عليه، ثم جلس، فقال النبي صلي الله عليه وسلم«عشر»، ثم جاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه، ثم جلس فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه وجلس فقال «ثلاثون».

অর্থাৎ : ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল অতঃপর বলল: আসসালামু আলাইকুম, রাসূল তার উত্তর দিলেন, অতঃপর সে বসল। রাসূলুল্লাহ স. বললেন ((দশ নেকী)), অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি আসল, সে বলল: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, রাসূল স. উত্তর দিলেন, অতঃর সে বসল। রাসূল স. বললেন ((বিশ নেকী))। অতঃপর আর একজন আসল। সে বলল: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

রাসূল স. উত্তর দিলেন এবং সে বসল। রাসূল স. বললেন—(ত্রিশ নেকী)।[১৪১]

সালামের বিধান এবং তার পদ্ধতি

প্রথমে সালাম দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। উত্তর দেওয়া ওয়াজিব, যখন সালামের দ্বারা শুধুমাত্র এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়। আর যদি সালামের দ্বারা কোনো দল বা জামাআতকে উদ্দেশ্য করা হয় তাহলে তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিবে কেফায়া। তবে যদি সকলেই উত্তর দেয় তা হলে অতি উত্তম।

উত্তর দেওয়ার সময় সালামের মত করে দেওয়া ওয়াজিব। উত্তর যদি সালাম থেকে বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে উত্তম, কিন্তু সালাম থেকে কম করা যাবে না। যেমন কেউ সালাম দিতে গিয়ে বলল —

السّـــلام عليكم ورحمة الله তাহলে এর ওয়াজিব উত্তর হবে وعليكم السلام ورحمة الله যদি সে وبركاته বাড়িয়ে বলে তা হলে উত্তম, কিন্তু وعليكم السلام বলে উত্তর সংক্ষেপে করা ঠিক নয়, কেননা এটি সালাম থেকে কম করা হল যা অনুচিত এবং কুরআনের বিধানের লঙ্ঘন। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

---

১৪১ দারামি : ২৫২৬

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ ﴾ [النساء: ٨٦]

আর তোমাদেরকে যদি কেউ দো'আ করে (সালাম দেয়), তাহলে তোমারও তার জন্য দো'আ কর (সালামের উত্তর দাও)। তার চেয়ে উত্তম দো'আ অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল।"[142]

ইবনে কাসীর (রহ) বলেন :অর্থাৎ কোনো মুসলিম সালাম দিলে উত্তর দেবে তার চেয়ে উত্তমভাবে অথবা নিদেন পক্ষে তার মত করে। বাড়িয়ে বলা মুস্তাহাব, আর তার মত উত্তর দেওয়া ফরয।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐ উত্তর বৈধ নয়, যে উত্তরে বলা হয় أهلا و مرحبا অথবা এর মত অন্য কিছু। কেননা এগুলো সালামের শরীয়ত সম্মত উত্তর নয়। আর তাছাড়া অন্য উত্তরগুলো সালাম থেকে অনেক ত্রুটিপূর্ণ। কেননা তার কথা وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته কোনো ব্যক্তি أهلا و مرحبا বলা থেকে অনেক মহত্ত্বপূর্ণ অর্থ দেয়। কিন্তু أهلا و مرحبا সালামের উত্তর ছাড়া অন্য সময় বলাতে দোষ নেই, সালামের উত্তর দেওয়ার পরে বলতে পারে রাসূল স.-এর কথা দ্বারা এর প্রমাণ আছে : রাসূল উম্মে হানিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

[142] সূরা নিসা: ৮৬।

« مرحبا بأم هانئ».

সালামের আদবসমূহ:

সালামের অনেক বিধান এবং আদব রয়েছে তার থেকে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল।

১। মানুষের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার ঘটাতে হবে, যাতে করে তা মুসলিমদের প্রকাশ্য প্রতীকে পরিনত হয়ে যায়। বিশেষ কোনো দলকে সালাম দেওয়া হবে অন্য কাউকে নয় তা যেন না হয়, অনরূপ ভাবে বড়দেরকে দিতে হবে ছোটদেরকে নয় বা যাকে চিনে তাকে দেবে যাকে চিনে না তাকে নয় এমনও যাতে না হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«أفشوا السلام بينكم».

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও। أي الإسـلام خير؟ (কোন সালাম উত্তম) প্রশ্নের উত্তরে রাসূল বলেছিলেন :—

«تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف».

সালাম দেবে পরিচিত-অপরিচিত সকলকে।[১৪৩]

আম্মার ইবন ইয়াসির র. বলেন—

«ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار».

যে ব্যক্তি নিজের মাঝে তিনটি গুণ একত্রিত করল, সে পরিপূর্ণ ঈমান হাসিল করল। নিজের উপর ইনসাফ করা, সালামের প্রচার করা, অভাব সত্ত্বেও খরচ করা।

সালাম না দেওয়ার নিন্দায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«أبخل الناس من بخل با لسلام».

সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি সেই যে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে কৃপণতা করে।[১৪৪]

---

১৪৩ বুখারী: ২৭

১৪৪ আহমাদ : ১৩৯৯২

২। উচ্চস্বরে সালাম দেওয়া এবং উত্তর দেওয়া সুন্নত। কেননা সালাম হল- السلام عليكم উচ্চারণ করা। হাত দ্বারা ঈশারা ইত্যাদি সালাম বলে বিবেচিত হবে না।

আর উত্তর উচ্চস্বরে দিতে হবে এর কারণ হচ্ছে: যিনি সালাম দাতাকে শুনিয়ে জবাব দিলেন না তিনি কেমন যেন তার জবাবই দিলেন না। তবে উত্তর শুনতে কোনো কিছু বাধা হলে সে ভিন্ন কথা এর জন্য সে দায়ী হবে না।

৩। অন্যের মাধ্যমে অপরের নিকট সালাম পৌঁছোনোর বিধানকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যাকে পৌঁছানো হবে তার উত্তর দেওয়া দায়িত্ব। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন—

«إن جبريل يقرأ عليك السلام فقالت: وعليه السلام ورحمة الله».

জিবরাঈল তোমাকে সালাম দিয়েছেন,

তিনি বললেন—(وعليه السلام ورحمة الله)

তার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

৪। উত্তম হল ছোট বড়কে প্রথমে সালাম দেবে। পদচারণায় লিপ্ত উপবিষ্টকে সালাম দেবে। আরোহণকারী পদচারণাকারীকে সালাম দেবে, কম লোক বেশি লোককে সালাম দেবে। আবু হুরাইরা রা. বলেন—

«يسلم الصغير علي الكبير والمار علي القاعد والقليل علي الكثير».

অর্থাৎ ছোট বড়কে সালাম দেবে অতিক্রমকারী (চলন্ত ব্যক্তি)উপবিষ্টকে সালাম দেবে, অল্প লোক বেশি লোককে সালাম দেবে।

৫। সুন্নত হল দুজন আলাদা হওয়ার পর পুনরায় সাক্ষাৎ হলে আবার সালাম দেওয়া —প্রবেশের কারণে হতে পারে, আবার বাহির হওয়ার কারণেও হতে পারে। অথবা চলতি পথে দু'জনের মাঝে কোনো দেওয়াল বা গাছ জাতিয় কিছুর বাধার কারণে আলাদা হয়েছিল। অতপর সাক্ষাৎ ঘটল। রাসূল স.-এর বাণী দ্বারা এমনই বুঝা যায় ।

«إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضًا».

অর্থাৎ : তোমাদের কেউ নিজ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে তাকে সালাম দেবে।অতঃপর যদি দুজনের মাঝে কোনো গাছ, দেওয়াল অথবা পাথর ইত্যাদি বাধার কারণে দু'জন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, খানিক পর পুনরায় সাক্ষাৎ হলে আবার সালাম দেবে।

যার নামাজ শুদ্ধ হচ্ছিল না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বারবার নামাজ শুদ্ধ করতে বলছিলেন: সে যতবার যাচ্ছিল এবং আসছিল রাসূল স.-কে সালাম দিচ্ছিল রাসূল স. তার উত্তর দিচ্ছিলেন। এরূপ তিন বার করেছিলেন।

وقال أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يتماشون فاذا استقبلتهم شجرةً أو أكمة فتفرقوأ يمينا وشمالاً ثم التقو من ورائها سلّم بعضهم علي بعض.

আনাস রা. বলেন রাসূলের সাহাবিরা হাঁটতেন যখন তাদের সামনে কোনো গাছ অথবা স্তূপ পড়ত, তাঁরা ডানে বামে আলাদা হয়ে যেতেন অতঃপর আবার সাক্ষাৎ ঘটত তখন একে অন্যকে সালাম দিতেন।

৬। সালাম শুধু মুমিনদের অভিবাদন, কাফেরদেরকে সালাম দেওয়া বৈধ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

«لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه».

অর্থাৎ ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদের সাথে তোমরা প্রথমে সালামের মাধ্যমে কথা শুরু করবে না। তাদের কারও সাথে রাস্তায় সাক্ষাৎ হলে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য করবে।[১৪৫]

এই কথার অর্থ হল তাদের জন্য বিনয় সম্মানের সাথে তাদের থেকে দূরে সরে দাঁড়াবে না। এর অর্থ এই নয় যে, প্রশস্ত রাস্তায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের জন্য সংকীর্ণ করে দেবে, কেননা এর দ্বারা তাদের কষ্ট দেওয়া হবে। আর কোনো কারণ ছাড়া তাদের কষ্ট দিতে নিষেধ করা হয়েছে। হ্যাঁ যদি এমন জায়গায় উপস্থিত হয় যেখানে কাফের মুসলিম একত্রে মিশছে, তবে সালাম দেবে এবং মুসলিম নিয়ত করবে।

أن النبي صلي الله عليه وسلم مرّ علي مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان فسلم عليهم.

অর্থাৎ : উসামা ইবন যায়েদ রা.-এর ঐ হাদিসের কারণে যে রাসূলুল্লাহ সা. অতিক্রম করলেন এক মজলিসের পাশ দিয়ে যেখানে

১৪৫ মুসলিম : ৪০৩০

মুসলিম-মুশরিক-পৌত্তলিক একত্রিত ছিল ; রাসূল স. তাদেরকে সালাম দিলেন।[১৪৬]

আর যদি অমুসলিম সালাম দেয় তাহলে তার উত্তর আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের পন্থা অনুযায়ী দিবে—

أن أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قالوا للنبي صلي الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا: «وعليكم ولا يزيد علي ذالك».

রাসূল স.-এর সাহাবীরা রাসূল স.-কে বললেন—আহলে কিতাবীগণ আমাদেরকে সালাম দেয় তাদের উত্তর কীভাবে দেব? রাসূল স. বললেন তোমরা বলবে (وعليكم) এর চেয়ে বেশি বলবে না।[১৪৭]

৭। কোনো কোন আলেম অমুসলিমদেরকে বিশেষ প্রয়োজনে সালাম ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা অভিবাদন জানানো বৈধ বলেছেন। যেমন শুভ সকাল বা শুভ রাত্রি ইত্যাদি।

---

১৪৬ বুখারী: ৪২০০

১৪৭ মুসলিম : ৪০২৫

৮। রক্তের সম্পর্কযুক্ত-মুহরিম নারীদেরকে সালাম দেওয়া জায়েয, বেগানা নারীদেরকেও জায়েয আছে যদি ফেতনা থেকে নিরাপদ হয়। নারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টি অবস্থাভেদে পৃথক হয়ে থাকে। তাদের অবস্থা এবং অবস্থান বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। যুবতী নারী বৃদ্ধা নারীর মত নয়, কেউ নিজের ঘরে প্রবেশ করে সেখানে অনেক নারী দেখতে পেল এবং তাদেরকে সালাম দিল, এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মত নয় যে অনেক মহিলাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল যাদেরকে সে চিনে না এবং সালাম দিল। অপরিচিত নারীদের সাথে মুসাফাহা করা একেবারে বৈধ নয়। এর প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী—

(ক) «لا أصافح النساء» আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না।

(খ) আয়েশা রা.-এর বাণী—

«ما مسّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، إلا امرأة يملكها».

অর্থাৎ : রাসূলুল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাত কখনও কোনো বেগানা নারীর হাত স্পর্শ করেনি।

যিয়ারতের বিধি-বিধান

যিয়ারতের প্রকারভেদ : যিয়ারত তিন প্রকার।

ক) বৈধ ও অনুমোদিত যিয়ারত : প্রত্যেক ঐ যিয়ারত যার মাধ্যমে শরয়ী উপকার হয় অথবা যার মাঝে জাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে।এবং প্রত্যেক ঐ যিয়ারত যা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার উদ্দেশ্যে হয়। কখনও তা ফরয হয়ে থাকে যেমন নিকট আত্মীয়ের যিয়ারত; আবার কখনও মুস্তাহাব যেমন আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ।

এই ধরনের সাক্ষাতের কিছু উদাহরণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের মাঝে আমরা পাই যার দ্বারা এর মর্যাদা বুঝা যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যিয়ারতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

«من عاد مريضا، أوزار أخًا له في الله، ناداه منادٍ أن طِبتَ وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا».

অর্থাৎ : যে ব্যক্তি কোনো রুগীকে দেখতে গেল অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার কোনো ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করল কোনো ঘোষণাকারী তখন ডেকে বলতে থাকে তুমি ভালো কাজ করেছ

তোমার চলা শুভ হোক এবং জান্নাতের মাঝে তুমি তোমার একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছ।[১৪৮]

খ) অবৈধ যিয়ারত:

প্রত্যেক ঐ যিয়ারত যার মাধ্যমে ধর্মীয় অথবা চারিত্রিক ক্ষতি হয়। যেমন কোনো হারাম কাজের জন্য যিয়ারত করতে যাওয়া অথবা অহেতুক কোনো খেলার জন্য একত্রিত হওয়া এগুলি শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

গ) বৈধ যিয়ারত:

এ এমন যিয়ারত যার দ্বারা কোনো ক্ষতি বা উপকার কিছুই হয় না এবং যার মাধ্যমে কোনো হারাম কাজও সঙ্ঘটিত হয় না। যেমন শুধু সময় কাটানোর জন্য যিয়ারত করা অথবা মুবাহ কথাবার্তা বলার জন্য সাক্ষাৎ করা। কোনো কোন সাক্ষাৎ আছে যা প্রকৃত পক্ষে প্রশংসনীয় এবং জায়েয কিন্তু তার সাথে এমন কিছু জড়িয়ে যায় যে তার মূল বিধানকেই পরিবর্তন করে দেয়। যেমন সাক্ষাতের সাথে কোনো অন্যায় কাজ যুক্ত হয়ে গেল। এখানে আবশ্যক হল ঐ নিষিদ্ধ কাজটি দূর করা যাতে সাক্ষাৎ তার নিজের অবস্থানে নিজ অবস্থানে

১৪৮ তিরমিযী : ১৯৩১

ঠিক থাকে। যদি সেই নিষিদ্ধ কাজকে বাদ দেওয়া সম্ভব না হয় তখন উক্ত জায়েয সাক্ষাৎ নাজায়েযে পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং সাক্ষাৎ কারীকে তা বাদ দেওয়া জরুরী হয়ে যাবে।

যিয়ারতের আদব সমূহ :

যিয়ারতের অনেক আদব রয়েছে,যেমন

১। যিয়ারতের নিয়ত এবং উদ্দেশ্যকে সঠিক করতে হবে। যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার নিয়ত করা এবং তাদের অধিকার আদায় করা। অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করবে বা সাক্ষাতের দ্বারা যে পুণ্য লাভ হয় তার নিয়ত করবে। অথবা পরস্পরে উপদেশ গ্রহণের নিয়ত বা সময়কে কাজে লাগানোর নিয়ত করা—ইত্যাদি।

২। সাক্ষাতের জন্য যথোপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা।পানাহারের নির্ধারিত সময়, আরাম অথবা ঘুমের সময় সাক্ষাৎ করা উচিত নয়।অনুরূপ ভাবে কারো নির্ধারিত কোনো সময় থাকে যখন কারো যিয়ারত সে পছন্দ করে না তখন সাক্ষাতের মাধ্যমে তার উপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া এবং বিরক্ত করা ঠিক নয়।

৩। যিয়ারতকারী অধিক সময় থেকে বা অন্য কোনো মাধ্যমে যার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছে তাকে বিরক্ত করা ও তার কাজের ব্যঘাত ঘটানো উচিত নয়। হ্যাঁ যদি সাক্ষাৎকারী জানতে পারে যে, তার সাথী অধিক সময় কাটানো অপছন্দ করেন না,তাহলে বিলম্ব করাতে দোষ নেই। সাক্ষাৎকারীকে তার সাথীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। হয়ত সে কোনো কাজে ব্যস্ত আছে বা কারো সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ আছে। আর এগুলি ব্যক্তির অবস্থা দ্বারা প্রকাশ পায়, যেমন চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠে অথবা বারবার ঘড়ির দিকে তাকায় বা বার বার আসা যাওয়া করতে থাকে এবং কখনও প্রকাশ্যেই বলে যে আমি ব্যস্ত। তখন সাক্ষাৎকারী অনুমতি নিয়ে বের হয়ে আসবে।

৪। সাক্ষাৎকারী সাজ গোজ করে পরিপাটি হয়ে যিয়ারতে আসবে, সাথে সাথে নিজ পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বেশ-ভূষা বিন্যস্ত করে নিবে। সুগন্ধি ব্যবহার করে নিজের দুর্গন্ধ দূর করবে। আবুল আলিয়া বলেন-মুসলিমরা যখন সাক্ষাতে যেতেন তখন সাজগোজ করতেন।

৫। স্বাক্ষাতপ্রার্থী অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বাক্ষাতদাতার অনুমতি দেওয়া ও না দেওয়া উভয়টিরই অধিকার রয়েছে। এখন যদি তিনি স্বাক্ষাতের অনুমতি না দিয়ে অপারগতা প্রকাশ করেন তাহলে

স্বাক্ষাতপ্রার্থীর সেটি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহন করা ও মনে কষ্ট নেয়া বা তার সম্পর্কে মনে বিরুপ ভাব পোষন করা ঠিক হবে না। কারণ কখনো কখনো সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ করতে হয়। আল্লাহ বলেন—

﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ ﴾ [النور: ٢٨]

তোমাদেরকে যদি বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এটি তোমাদের জন্য পবিত্রতর।[১৪৯]

কাতাদাহ রা. বলেন: কোনো কোন মুহাজির বলেছেন: সারা জীবন (অন্তত একবারের হন্যে হলেও) এই আয়াতের উপর আমল করতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি; আমার কোনো ভাইয়ের নিকট প্রবেশের অনুমতি চেয়েছি অতঃপর তিনি বলেছেন ফিরে যাও আমি ফিরে এসেছি আর আমার হৃদয় তার উপর সন্তুষ্ট ।

৬। সাক্ষাৎকারীর কর্তব্য হল: ঘরে প্রবেশ করে দৃষ্টি সংযত রাখবে, কানের হেফাযত করবে এবং অসংগত ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশ্ন করবে না। বাড়িওয়ালা যেখানে বসতে বলবে সেখানে বসবে তার অনুমতি ছাড়া বের হবে না। যখন বের হবে সালাম দেবে।

---

১৪৯ নুর-২৮

৭। অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করা কারো পক্ষেই জায়েয নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ﴾ [النور: ٢٧]

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না।[১৫০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع».

তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর অনুমতি না মিললে ফিরে আসবে।[১৫১]

অনুমতি চাওয়ার এ বিধান আরোপের তাৎপর্য :

ক) ঐ সময় বাড়িতে কারও প্রবেশ করা হয়ত বাড়িওয়ালাদের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে, তাই অনুমতি চাওয়ার এ বিধান

---

১৫০ নুর ২৭

১৫১ বুখারী: ৫৭৭৬

দেওয়া হয়েছে যাতে বাড়িওয়ালা অবাঞ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া থেকে বেঁচে যেতে পারে।

খ) এর মাধ্যমে ঘরের গোপন বিষয়গুলি সংরক্ষিত থাকবে। ঘরের লোকদের পর্দা হবে।

গ) অনুমতি প্রার্থনা দ্বারা, হঠাৎ প্রবেশের মাধ্যমে ঘরের লোকদের ঘাবড়ে যাওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়।

৮। অনুমতি প্রার্থনার গুরুত্ব অনেক আর তাই তার কিছু আদব এবং বিধান রয়েছে :

ক) অনুমতি প্রার্থনার বৈধ পদ্ধতি হচ্ছে তিনবার প্রার্থনা করবে, যদি অনুমতি দেয় তো প্রবেশ করবে অন্যথায় ফিরে আসবে। অনুমতি প্রার্থনার সময় একবার অনুমতি চাওয়ার পর পাওয়া না গেলে সামান্য বিরতি দিয়ে পরের বার চাইবে। অর্থাৎ মাঝখানে কিছু সময় বিরতি দিয়ে অনুমতি চাইবে।

খ) অনুমতি প্রার্থনাকারীর দরজায় করাঘাত বা শব্দকরে ডাক দেওয়াটা অত্যন্ত ভদ্রচিত ও কমলতার সাথে হওয়া বাঞ্চনীয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেন :—

«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنـزَع من شيء إلا شانه».

কোমলতা ও নম্রতা যার সাথেই যুক্ত হবে সেই সুন্দর ও মর্যাদাবান হবে, আর যার থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে সেই অসুন্দর ও অসম্মানিত হবে।[১৫২]

গ) যখন বলা হবে: দরজায় কে? বলবে! অমুকের পুত্র অমুক নিজের ঐ নাম বলবে যার দ্বারা সহজে চেনা যায়। বলবে না ‘আমি’। কেননা এই শব্দ প্রত্যেকের উপর বর্তায়। সে বুঝতে পারবে না যে কে দরজা নাড়া দিচ্ছে।

وفي حديث جابر أنه طرق على النبي صلى الله عليه وسلم الباب، فقال: «من ذا»؟ فقلت: أنا، فقال: «أنا أنا» كأنه كرهها.

জাবের রা.-এর হাদীসে এসেছে তিনি নবীর দরজা নাড়া দিলেন নবী বললেন—কে? আমি বললাম (আমি) নবীজী বললেন ‘আমি’ ‘আমি’। মনে হয় তিনি অপছন্দ করলেন।[১৫৩]

ঘ) অনুমতি প্রার্থনাকারী দরজার একেবারে সামনে দাঁড়াবে না, ডানে অথবা বামে সরে দাঁড়াবে, দরজা খুললেই যাতে বাড়ির ভিতরের অবস্থা সামনে এসে না পড়ে।

---

১৫২ মুসলিম : ৪৬৯৮

১৫৩ মুসলিম : ৪০১২

ঙ)অনুমতি প্রার্থনার বিষয়টি ব্যাপক, প্রত্যেকের জন্যেই সর্বাবস্থায় এটি প্রযোজ্য। সুতরাং কেউ যদি নিজের পিতার ঘরে বা মায়ের ঘরে বা বোনের ঘরে প্রবেশ করতে চায় তখনও অনুমতি নিতে হবে।

চ) অনুমতি প্রার্থনার ক্ষেত্রে নারীরাও পুরুষের মত, উভয়ের জন্যে একই বিধান প্রযোজ্য।অনেক নারীরা এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে থাকেন, ঘরে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করেন। এটি মানুষের মাঝে বহুল প্রচলিত ভুলের মধ্য থেকে একটি।

পানাহারের আদব

আল্লাহর বান্দাদের উপর যতগুলি অনুগ্রহ আছে তার মাঝে অন্যতম প্রধান অনুগ্রহ হল পানাহার। মানুষের শরীর গঠন,বর্দ্ধন ও টিকে থাকার মূল উপাদান হচ্ছে পানাহার। এই নেয়ামতের দাবি হল এর দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর এ কৃতজ্ঞতা আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর দেওয়া বিধান পালন করার মাধ্যমে আদায় করা যেতে পারে।এ নেয়ামতের আরো একটি দাবি হচ্ছে, এর সহায়তায় আল্লাহর নাফরমানি করা যাবে না।

পানাহারের অনেকগুলো আদব ও বিধান রয়েছে, যাকে দুইভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

প্রথমত: যে বিষয়গুলোর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। যেমন:

১) খাদ্য এবং পানীয় জাতীয় জিনিসের সম্মান করা, আর এই বিশ্বাস রাখা যে এগুলি আল্লাহর নেয়ামত যা আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়েছেন।

২) খাদ্য জাতীয় জিনিসকে অবহেলা-অসম্মান না করা; ডাস্টবিন ও ময়লা আবর্জনার ভিতরে না ফেলা।

৩) খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা। বিশুদ্ধ অভিমত হল: খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব, কেননা অনেকগুলো সহীহ

এবং সুস্পষ্ট হাদীস এ নির্দেশই করে। আর এ নির্দেশের বিপরীত কোনো হাদীস নেই। এ মতের বিরুদ্ধে সর্বসম্মত ঐক্যমত্যও সৃষ্টি হয়নি যে, এর প্রকাশ্য অর্থ থেকে বের করে দেবে। আর যে ব্যক্তি পানাহারের সময় বিসমিল্লাহ বলবে না তার পানাহারে শয়তান শরীক হবে।

বিসমিল্লাহ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ সমূহ :—

عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا غلام، سمّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك».

আমর ইবন আবু সালামা থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন:হে বৎস! বিসমিল্লাহ বল এবং ডান হাত দিয়ে খাও। আর খাবার পাত্রের যে অংশ তোমার সাথে লাগানো সে অংশ থেকে খাও।[১৫৪]

وفي حديث حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه».

---

১৫৪ বুখারী: ৪৯৫৮

অর্থাৎ, হুযাইফা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, শয়তান ঐ খাবারকে নিজের জন্য হালাল মনে করে যার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা হয় নি।[১৫৫]

(১) বান্দা খাবার পাত্রের যেদিক তার সাথে লাগানো সেদিক থেকে খাবে। উপরে বর্ণিত উমর ইবন আবু সালামা রা.-এর হাদীসের কারণে। আর খাবার যদি বিভিন্ন ধরনের হয় তা হলে অন্যদিক -যা তার সাথে লাগোয়া নয়- থেকে খাওয়াতে কোনো দোষ নেই।

(২) যদি খাবারের কোনো লোকমা পড়ে যায় তবে উঠিয়ে খাবে, যদি ময়লা লাগে ধুয়ে ময়লা মুক্ত করে খাবে। কারণ এটিই সুন্নত এবং এর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

«إذا سقطت لقمة أحدكم فليُمِط عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدَعْها للشيطان».

অর্থাৎ, যদি তোমাদের কারো খাবারের লোকমা পড়ে যায় তবে তার থেকে ময়লা দুর করবে এবং তা খেয়ে ফেলবে, শয়তানের জন্য রেখে দেবে না।[১৫৬]

---

১৫৫ মুসলিম : ৩৭৬১

(৩) খাবারের প্লেট পরিষ্কার করবে, তার ভিতর যা কিছু থাকবে মুছে খাবে।

عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنكم لا تدرون في أيه البركة».

জাবের রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুল এবং বর্তন চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন তোমরা জানো না কোনটায় বরকত রয়েছে।[157]

وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسلت القصعة، قال: «فإنكم لا تدرون في أيّ طعامكم البركة».

আনাস রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকে বর্ণনা করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন বর্তন পরিষ্কার করে খাই। তিনি বলেন—তোমরা জানো না তোমাদের খাবারের কোনো অংশে বরকত

---

১৫৬ মুসলিম : ৩৭৯৪

১৫৭ মুসলিম : ৩৭৯২

রয়েছে। বরকত দ্বারা উদ্দেশ্য হল যার দ্বারা উপকার এবং পুষ্টি লাভ হয়।[১৫৮]

(৪) আঙুল ধোয়ার পূর্বে চেটে খাবে—

عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.

কা'ব ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি তিন আঙুল দিয়ে খাচ্ছেন এবং খাওয়া শেষে আঙুল চেটে খাচ্ছেন।[১৫৯]

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة».

আবু হুরাইরা রা. থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত, যখন তোমরা কেউ খাবার খাবে তার উচিত আঙুল চেটে খাওয়া কেননা সে জানে না কোনো আঙুলে বরকত রয়েছে।[১৬০]

---

১৫৮ তিরমিযী : ১৭২৫

১৫৯ মুসলিম : ৩৭৯০

১৬০ মুসলিম : ৩৭৯৩

আলেমগণ বলেন: নির্বোধ-মূর্খ লোকদের আঙুল চেটে খাওয়াকে অপছন্দ করা ও একে অভদ্রতা মনে করাতে কিছু যায় আসে না। তবে হ্যাঁ খাওয়ার মাঝখানে আঙুল চেটে খাওয়া উচিত নয়। কেননা আঙুল আবার ব্যবহার করতে হবে আর আঙুলে লেগে থাকা লালা ও থুতু প্লেটের রয়ে যাওয়া খাবারের সাথে লাগবে আর এটি এক প্রকার অপছন্দনীয়ই বটে।

(৫) খাবারের প্রশংসা করা মুস্তাহাব, কেননা এর মাধ্যমে খাবার আয়োজন ও প্রস্তুতকারীর উপর একটা ভালো প্রভাব পড়বে। সাথে সাথে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো এমন করতেন—

عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهلَه الأُدُمَ، فقالوا: ما عندنا إلا خلّ، فدعا به، فجعل يأكل به، ويقول: «نعم الأُدُم الخلّ، نعم الأُدُم الخل».

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবারের নিকট তরকারী চাইলেন। তারা বললেন, আমাদের কাছে সিরকা ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি সিরকা আনতে বললেন এবং তার দ্বারা খেতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, সিরকা কতইনা উত্তম তরকারী; সিরকা কতইনা উত্তম তরকারী।

(৬) পানি পানকারীর জন্য সুন্নত হল: তিন শ্বাসে পান করা। একটু পান করার পর পাত্র মুখ থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে শ্বাস নিবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার এরপর একই ভাবে তৃতীয়বার। যেমন আনাস রা.-এর হাদীসে এসেছ—

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، وفي رواية لمسلم: «ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ».

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করার মাঝে তিনবার শ্বাস নিতেন। মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলতেন: এইভাবে পান করা অধিক পিপাসা নিবারণকারী অধিক নিরাপদ অধিক তৃপ্তিদায়ক।

পানাহারের শেষে আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ তাঁর প্রশংসা করবে। সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে অন্তত আলহামদুলিল্লাহ বলা।

«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها».

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি খাবারের পর আল্লাহর প্রশংসা করে অনুরূপ পান করার পর আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ সে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

আর যদি হাদীসে বর্ণিত কোনো দো‘আ পড়ে তাহলে তা হবে সর্বোত্তম। সবচেয়ে বিশুদ্ধ দোআ যা সাহাবী আবু উমামার হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দস্তরখান উঠাতেন তখন বলতেন:

«الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفي ولا مودع، ولا مستغنى عنه ربّنا»

(৭) যখন অনেক লোকের সাথে বসে পান করবে আর পান করার পর কাউকে দিতে চাইবে তাহলে ডান পাশ্বে বসা ব্যক্তিকে দিবে, সে যদি বয়সে ছোট হয় আর বাম পার্শ্বস্থজন তার থেকে বড়, তবুও। হ্যাঁ; যদি ছোট থেকে অনুমতি নিয়ে বড়কে দেওয়া হয় তাহলে কোনো দোষ নেই। আর যদি অনুমতি না দেয় তাহলে তাকেই দিবে কারণ সেই আগে পাওয়ার বেশি অধিকার রাখে। এর প্রমাণ হল, সাহাবী সাহল ইবন সা‘দ রা.-এর হাদীস :—

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال الغلام: لا والله! لا أوثر بنصيبي منك أحداً، قال: فتَلَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু পানীয় আনা হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করলেন। রাসূলের ডান দিকে একটি ছোট ছেলে বসা ছিল এবং বামদিকে

বয়স্ক লোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটিকে বললেন—তুমি কি আমাকে তোমার আগে তাদেরকে দেওয়ার অনুমতি দিবে? তখন ছেলেটি বলল, না, কখনও নয়। আল্লাহ শপথ! আমি আমার অংশের উপর আপনি ব্যতীত অন্য কাউকে প্রাধান্য দেব না। বর্ণনাকারী বলেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পানপাত্র) ছেলেটির হাতে দিয়ে দিলেন।[১৬১]

আর এক হাদিসে আনাস রা. বর্ণনা করেন :—

وفي حديث آخر: عن أنس رضي الله عنه أنه كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، وعن يساره أبو بكر، وعُمَرُ وُجَاهَه، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: يا رسول الله أعط أبا بكر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي، وقال:«الأيمن فالأيمن».

এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডানে ছিলেন এক বেদুঈন সাহাবী এবং বামে আবু বকর আর উমর ছিলেন তাঁর সোজাসুজি। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান শেষ করলেন উমর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আবু বকরকে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানে বসা উক্ত বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন: (নিয়ম হচ্ছে) আগে ডান অতঃপর

---

১৬১ বুখারী: ২৪১৫

ডান। অর্থাৎ প্রথমে ডান পাশের জন পাবে অতঃপর তার ডান পাসের জন এবং এভাবেই ।

وفي رواية لمسلم قال: «الأيمنون، الأيمنون، الأيمنون». قال أنس رضي الله عنه: فهي سنّة، فهي سنّة، فهي سنّة.

মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, ডান দিকের লোক ডান দিকের লোক ডান দিকের লোক। আনাস রা. বলেন : এটিই সুন্নত, এটিই সুন্নত, এটিই সুন্নত।[১৬২]

দ্বিতীয়ত : যে বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক :

১। পানাহারে অহেতুক খরচ করা, আল্লাহ তা'আলা বলেন—

﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ وَلَا تُسۡرِفُوٓا۟ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴾ [الاعراف: ٣١]

অর্থাৎ : খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।[১৬৩]

---

১৬২ বুখারী: ২৩৮৩

১৬৩ আল-আরাফ-৩১

২। প্রয়োজন ছাড়া বাম হাতে খাওয়া হারাম। বেশ কিছু হাদীস এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যেতে পারে।

(ক) বাম হাতে খাওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা—যেমন জাবের (রা.)-এর হাদীসে মারফুতে এসেছে :—

«لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال».

অর্থাৎ : তোমরা বাম হাতে খেয়ো না, কেননা শয়তান বাম হাতে খায়।

(খ) ডান হাতে খাওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ- যেমন ইবনে উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত মারফু হাদীসে এসেছে—

«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله».

অর্থাৎ: তোমরা কেউ যখন খাবে ডান হাতে খাবে যখন পান করবে ডান হাতে পান করবে, কেননা শয়তান বাম হাতে খায়। বাম হাতে পান করে।[১৬৪]

এই ধরনের নির্দেশের অর্থ হল বাম হাতে খাওয়া হারাম।

---

১৬৪ মুসলিম : ৩৭৬৩

(গ) বাম হাতে খেলে শয়তানের সাথে সাদৃশ্য হয়। যেমন পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এবং অমুসলিমদের সাথেও সাদৃশ্য হয়। আর শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক উভয়টিই নিষিদ্ধ ও হারাম।

(ঘ) বাম হাতে খাবার গ্রহনকারী জনৈক ব্যক্তিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বদ দো'আ করা এবং এর কারণ বর্ণনা করা যে এটি অহংকার মূলক কাজ।

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع، قال: «لا استطعت»، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه.

অর্থাৎ সালামা ইবন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে বাম হাতে খাচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ডান হাতে খাও। সে বলল আমি পারব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আর কখনও পারবেও না। একমাত্র অহংকারই তাকে ডান হাত দিয়ে খাওয়া থেকে বিরত রাখল। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর সে আর কখনো মুখের কাছে হাত উঠাতে পারেনি।[১৬৫]

১৬৫ মুসলিম : ৩৭৬৬

৩। দাঁড়িয়ে পানাহার করা মাকরূহ, সুন্নত হল বসে পানাহারকার্য সম্পন্ন করা।

عن أنس رضي الله عنه أن النبي نهى أن يشرب الرجل قائماً، قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال (أنس): ذلك أشر وأخبث.

অর্থাৎ : আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদাহ রা. বলেন : আমরা বললাম তাহলে দাঁড়িয়ে খাওয়ার হুকুম কি? আনাস বললেন সেটাতো আরো বেশি খারাপ আরো বেশি দূষণীয়।[১৬৬]

৪। কোনো কিছুর উপর হেলান দিয়ে আহার করা মাকরূহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إني لا آكل متكئاً

আমি হেলান দিয়ে আহার করি না।

---

১৬৬ মুসলিম : ৩৭৭২

ইবনে হাজার রহ. বলেন: খাওয়ার জন্য বসার মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে। দুই হাটু গেড়ে, দুই পায়ের পিঠের উপর বসা। অথবা ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।

৫। খাওয়ার পাত্রে ফু দেওয়া এবং তার ভিতর নিঃশ্বাস ফেলা মাকরূহ। ইবনে আব্বাস রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে,

«نهى أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه».

অর্থাৎ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার পাত্রে ফু দেওয়া বা শ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।[১৬৭]

وعن أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء».

আবু কাতাদাহ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন: তোমাদের কেউ যেন প্রস্রাব করার সময় পুরুষাঙ্গ ডান হাত দ্বারা স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দ্বারা যেন ইস্তেনজা না করে। অনুরূপ খাবার পাত্রে যেন শ্বাস না ফেলে।[১৬৮]

---

১৬৭ তিরমিযী : ১৮১০

১৬৮ মুসলিম : ৩৯২

৬। খাবারের দোষ বের করা ও বর্ণনা করা মাকরূহ। বরং আগ্রহ হলে খাবে, মনে না চাইলে দোষ ধরা ব্যতীত বাদ দেবে।

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «ما عاب رسول الله ﷺ طعاماً قط، كان إذا اشتهى شيئاً أكله، وإن كرهه تركه».

আবু হুরাইরা রা. বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কোনো খাবারের দোষ বের ও বলাবলি করেননি, মনে চাইলে খেতেন। অপছন্দ হলে রেখে দিতেন।

ঘুমানো এবং জাগ্রত হওয়ার আদব

ঘুম আল্লাহ তা‘আলার একটি বিশাল নেয়ামত, এর মাধ্যমে তিনি নিজ বান্দাদের উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। এবং তাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। আর নেয়ামতের দাবি হল শুকরিয়া আদায় করা তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ وَمِن رَّحۡمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسۡكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٧٣ ﴾ [القصص: ٧٣]

তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন যাতে তোমরা রাত্রে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[১৬৯]

﴿ وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتٗا ٩ ﴾ [النبا: ٩]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী।[১৭০]

---

১৬৯ আল কাসাস : ৭৩

১৭০ আন নাবা : ৯

দিনের ক্লান্তিকর চলাফেরার পর রাত্রে শরীরের প্রশান্তি শরীর সুস্থ থাকাকে সাহায্য করে। অনুরূপ ভাবে শরীরের বর্ধন এবং কর্ম চাঞ্চল্যতেও সাহায্য করে। যাতে করে ঐ দায়িত্ব পালন করতে পারে যার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে যা কিছু অতি জরুরী ঘুম তার অন্যতম। মুমিন বান্দা যদি ঘুমের মাধ্যমে দেহ ও মনকে আরাম দেওয়ার নিয়ত করে, যাতে করে সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের বিষয়ে আরো দৃঢ় হতে পারে। অতঃপর ঘুমের সমস্ত সুন্নত ও শরয়ী আদব পরিপূর্ণ রূপে পালন করার চেষ্টা করে, তবে তার ঘুম ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হবে এবং সে পুণ্য লাভ করবে।

সাহাবী মু'আয ইবন জাবাল রা. বলতেন :—

«أما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي».

আর আমি (রাতে) ঘুমাই এবং জাগ্রত হয়ে সালাত আদায় করি, জাগ্রত থেকে সালাত আদায়ের মাধ্যমে যে ভাবে ছাওয়াবের আশা করি ঠিক তেমনি করে ঘুমানোর মাধ্যমেও ছাওয়াবের আশা করি।[১৭১]

১৭১ বুখারী: ৩৯৯৮

قال ابن حجر رحمه الله: معناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب،

ইবনে হাজার রহ. বলেন এর অর্থ হল: তিনি আরামের ভিতর পুণ্য আশা করতেন যেমন কষ্টের ভিতর আশা করতেন।

কেননা, আরামের উদ্দেশ্য যদি ইবাদত করার জন্য সাহায্য সঞ্চয় করা হয়, তবে সে আরামের দ্বারা পুণ্য হবে। এখানে মু'আয ইবনে জাবাল রা.-এর জাগ্রত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাতের নামায।

ঘুমের কতিপয় আদব এবং বিধান:

(১) অধিক রাত্রি জাগরণ না করে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া মুস্তাহাব—

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং নামাযের পর অহেতুক গল্প-গুজব করাকে খুব অপছন্দ করতেন ।[১৭২]

কিন্তু ভালো ও নেক কাজের জন্য এশার পরে জাগ্রত থাকাতে কোনো ক্ষতি নেই। যেমন মেহমানের সাথে কথা বলা অথবা ইলমী

১৭২ বুখারী: ৫১৪

আলোচনা করা অথবা পরিবারকে সময় দেওয়া ইত্যাদি। মোটকথা, যে জাগ্রত থাকা কোনো ক্ষতির কারণ হবে না যেমন ফজরের নামায নষ্ট হয়ে যাওয়া, সে জাগ্রত থাকাতে কোনো ক্ষতি নেই।

তাড়াতাড়ি ঘুমানোর উপরকারিতা

ক) সুন্নতের অনুসরণ।

খ) শরীরকে আরাম দেওয়া, কেননা দিনের ঘুম রাত্রের ঘুমের ঘাটতি পূরণ করতে পারে না।

গ) ফজরের নামাযের জন্য খুব সহজে এবং পূর্ণ শক্তি ও চাঞ্চল্যতার সাথে জাগ্রত হওয়া যায়।

ঘ) তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য শেষ রাতে জাগ্রত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য এটি বড় সহায়ক ।

২। প্রত্যেক মুসলিমকে সব সময় ওযু অবস্থায়ই ঘুমাতে চেষ্টা করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারা ইবনে আযেব রা.-কে বলেছিলেন—

«إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة».

যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন নামাযের ওযুর মত ওযু করবে।[১৭৩]

৩। ডানদিকে পাশ ফিরে ঘুমাবে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

«ثم أضطجع على شقك الأيمن».

অতঃপর ডান কাত হয়ে ঘুমাও।

৪। উপুড় হয়ে ঘুমানো মাকরূহ। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

«إنها ضجعة يبغضها الله عز وجل».

এটি এমন শয়ন, যাকে আল্লাহ তা'আলা খুব অপছন্দ করেন।

৫। ঘুমানোর সময় হাদীসে বর্ণিত আযকার ও দো'আ থেকে সাধ্যানুযায়ী পড়ার চেষ্টা করবে। যিকির তথা আল্লাহর নাম নেয়া ব্যতীত ঘুমানো মাকরূহ।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত—

---

১৭৩ মুসলিম : ৪৮৮৪

«ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه من الله تِرَة يوم القيامة»

যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির ছাড়া শুয়ে পড়বে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আক্ষেপের বিষয় হবে।[১৭৪]

হাদীসে বর্ণিত (ঘুমানোর সময়ের) কিছু দো'আ:

ক) আয়াতুল কুরসী পড়া।

عن أبي هريرة قال: وكّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام... وذكر الحديث، وفيه أن هذا الآتي قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال معك من الله تعالى حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صدقك، وهو كذوب، ذاك شيطان».

অর্থাৎ আবু হুরাইরা রা. বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযানের ফিতরা সংরক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। কোনো এক আগন্তুক আমার কাছে আসল, এবং অঞ্জলি ভরে খাবার (চুরি) সংগ্রহ করতে লাগল।... এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। - তাতে আছে- আগন্তুক তাকে বলল : তুমি যখন তোমার বিছানায়

১৭৪ আবু দাউদ : ৪৮০০

যাবে তো আয়াতুল কুরসী পড়বে, কেননা এর মাধ্যমে সর্বক্ষণ তোমার সাথে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন হেফাযতকরী থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে ঘেঁসতে পারবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমাকে সত্য বলেছে অথচ সে বড় মিথ্যাবাদী। সে হচ্ছে শয়তান।[১৭৫]

খ) সূরা এখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়া।

আয়েশা রা. বর্ণনা করেন:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه- كل ليلة – جمع كفيه ثم نفث فيهما، وقرأ فيهما ﴿قل هو الله أحد﴾ و ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ و ﴿قل أعوذ برب الناس﴾، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، بدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রতি রাত্রিতে নিজ বিছানায় যেতেন দুই হাতের কবজি পর্যন্ত একত্রিত করতেন অতঃপর তারমাঝে ফু দিতেন এবং সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন । অতঃপর দুই হাত যথা সম্ভব সমস্ত শরীরে

১৭৫ বুখারী: ৩০৩৩

মলে দিতেন। মাথা,চেহারা এবং শরীরের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। এরূপ পরপর তিনবার করতেন।[১৭৬]

গ) اللَّهُمَّ باسمك أموت وأحيا দোআটি পড়া।

অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনার নামে মারা যাই এবং আপনার নামেই জীবিত হই।

ঘ) নিম্নোক্ত দোআটি পড়া-

«اللَّهُمَّ أسلمت نفسي إليك، وفوّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا مَنجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيّك الذي أرسلت».

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দিয়েছি। আমার বিষয় আপনার কাছে সোপর্দ করেছি। আমার পিঠ আপনার সাহায্যে দিয়েছি আপনার প্রতি আশা এবং ভয় নিয়ে, আশ্রয় নেয়ার ও আপনার শাস্তি থেকে বাঁচার মত জায়গা আপনি ছাড়া আর কেউ

১৭৬ তিরমিযী : ৩৩২৪

নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনার অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং আপনার প্রেরিত নবীর প্রতি।[১৭৭]

৬। ঘুমের মাঝে অনাকাংখীত ও অপছন্দনীয় কিছু দেখলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি কাজ করতে বলেছেন।

ক) বাম দিকে তিন বার থুতু ফেলবে।

খ) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم বলে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাইবে।

গ) এ স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না।

ঘ) যে কাতে শোয়া ছিল সে কাত থেকে ঘুরে শোবে অর্থাৎ পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোবে।

ঙ) নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম র. এ পাঁচটি কাজ উল্লেখ করে বলেন: যে এই কাজগুলো করবে খারাপ স্বপ্ন তার ক্ষতি করতে পারবে না বরং এ কাজ তার ক্ষতি দূর করে দেবে।

---

১৭৭ বুখারী: ৫৮৩৬

৭। সন্তানদের বয়স দশ বছর হয়ে গেলে তাদের বিছানা আলাদা করে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع».

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের আদেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বৎসর হবে এবং এর জন্য তাদেরকে শাস্তি দাও যখন তাদের বয়স দশ বৎসর হবে এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।[১৭৮]

৮। মুসলিম অবশ্যই সর্বদা ফজরের নামাযের পূর্বে জাগ্রত হবে যেন নামায সময় মত জামাতের সাথে ঠিকভাবে আদায় করতে পারে। এ ব্যাপারে চেষ্টা করা এবং এতে সহায়তাকারী উপকরণাদি গ্রহন করা তার জন্য ওয়াজিব।

سئل النبي عن رجل نام حتى أصبَح؟ قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه».

---

১৭৮ আবু দাউদ : ৪১৮

এক ব্যক্তি ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল তার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল। রাসূল বললেন: ঐ ব্যক্তির কর্ণ-দ্বয়ে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।[১৭৯]

৯। মুসলিম ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর নিম্নোক্ত দো'আ পড়া মুস্তাহাব:

«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور».

«الحمد لله الذي ردّ علي روحي وعافاني في جسدي، وأذِن لي بذكره».

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে মৃত্যু দেওয়ার পর জীবিত করে দিয়েছেন এবং তার কাছেই ফিরে যাব।

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লার জন্য যিনি আমার আত্মাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমার শরীরকে সুস্থ রেখেছেন এবং আমাকে তার স্মরণের অনুমতি দিয়েছেন।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণে মিসওয়াক করবে।

---

১৭৯ নাসায়ী : ১৫৯০

রসিকতা

সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষের জীবনাচারের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে মিশে আছে হাসি-তামাশা ও আনন্দ-রসিকতা। এ ক্রিড়া-কৌতুক ও আনন্দ-রসিকতা মানুষের জীবনে বয়ে আনে এক অনাবিল প্রান চাঞ্চল্য ও উদ্যমতা। মানুষকে করে ঘনিষ্ঠ। তাদের আবদ্ধ করে এক অকৃত্রিম ভালবাসার মায়াডোরে।

আনন্দ-রসিকতার এ মহোময় ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয় সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব, সাথী-সঙ্গী, নিজ সন্তানাদি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে।বরং কোনো মানুষই এ আনন্দঘন কর্ম থেকে মুক্ত নয়। তবে কেউ কম আর কেউ বেশি।

মুসলিম আল্লাহ তা'আলার বান্দা হিসাবে তার জীবনের প্রতিটি পর্বকে সাজাতে হবে মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী। যাতে তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হয়।

বর্তমানে মানুষের মাঝে হাসি-তামাশার প্রচলন একটু বেশি। তাই তার ধরণ-প্রকৃতি, হুকুম ও প্রকার এবং এ বিষয়ে শরয়ী দৃষ্টিকোণ কি সে সম্পর্কে জানা আবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছে। যাতে

মুসলিমরা সেগুলো মেনে চলতে পারে ও একঘেয়েমি দূরকারী এ সুন্দর পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে না হয়। এবং এর শরয়ী দিকনির্দেশনা অবলম্বন করে যেন পুণ্য অর্জন করতে পারে পাশাপাশি নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে পারে।

রসিকতা তিন প্রকার:

(১) অনুমোদিত বরং প্রশংসাযোগ্য রসিকতা : আর সেটি হচ্ছে, যা ভালো উদ্দেশ্যে, সৎ নিয়তে এবং শরয়ী নিয়ম নীতি অবলম্বন করে সম্পাদন করা হয়। যেমন মাতা-পিতার সাথে আদবের সহিত রসিকতা করা অথবা স্ত্রী, সন্তানদের সাথে অনুরূপ বন্ধু-বান্ধবদের সাথে তাদের অন্তরে আনন্দ-খুশির উপস্থিতির জন্য। এগুলির দ্বারা রসিকতাকারীর পুণ্য লাভ হয়।

এই প্রকার রসিকতার অনুমোদনে প্রমাণাদি :

ক) হানযালাহ রা. এর হাদীস :

وفيه أنه قال: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال: «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكّرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، إنْ لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي

الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم، وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات.

-সে হাদীসে আছে- তিনি বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হানযালাহ মুনাফেক হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কীভাবে? আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা যখন আপনার কাছে থাকি আর আপনি আমাদেরকে বেহশত-দোযখের কথা স্মরণ করান, মনে হয় যেন চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি। যখন আপনার নিকট থেকে চলে যাই আর আমাদের স্ত্রী সন্তান সন্ততি এবং বিভিন্ন সাংসারিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তখন এর অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যার হাতে আমার জান তার শপথ: আমার নিকট থাকা কালীন সময়ে তোমাদের অবস্থা যেমন হয় যদি তোমরা সর্বদা ঐ অবস্থায় থাকতে এবং জিকিরের সাথে পূর্ণসময় অতিবাহিত করত, তাহলে অবশ্যই ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় ও চলার রাস্তায় তোমাদের সাথে করমর্দন করত। কিন্তু হে হানযালাহ কিছু সময় এভাবে কিছু সময় ঐ ভাবে। কথাটি তিনবার বললেন।[১৮০]

---

১৮০ মুসলিম : ৪৯৩৭

খ) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. এর হাদীসে এসেছে :

لما تزوّج، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: «يا جابر، تزوجت؟» قال: قلت: نعم، قال: «فبكر أم ثيّب؟» قال: قلت: بل ثيّب، يا رسول الله، قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك» أو قال: «تضاحكها وتضاحكك».

অর্থাৎ : যখন তিনি বিবাহ করলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন: হে যাবের তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম: হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: কুমারী না বিবাহিতা? তিনি বলেন: আমি বললাম: বিবাহিতা। রাসূলুল্লাহ বললেন: তুমি কুমারী মেয়ে বিবাহ করলে না কেন? তাহলে তুমি তার সাথে খেলা করতে এবং সেও তোমার সাথে খেলা করতো। অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তুমি তার সাথে হাসতে এবং সে তোমার সাথে হাসতো।[১৮১]

গ) আয়েশা রা. এর হাদীসে এসেছে :—

أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسَبَقتُه على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: «هذه بتلك السبقة».

---

১৮১ বুখারী: ৫৯০৮

অর্থাৎ : কোনো এক সফরে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন। আয়েশা রা. বলেন : আমি রাসূলের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পিছনে ফেলে দিলাম। অতঃপর যখন আমার শরীর মোটা হয়ে গেল আবার প্রতিযোগিতা করলাম রাসূল বিজয়ী হলেন। তখন বললেন: এই বিজয় ঐ বিজয়ের পরিবর্তে (শোধ)।[১৮২]

ঘ) আনাস রা. থেকে বর্ণিত:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا ذا الأذنين»، قال أبو أسامة-أحد رواة الخبر- يعني: يمازحه.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাকে এ বলে সম্বোধন করেছিলেন: ((হে দুই কান বিশিষ্ট ব্যক্তি)) হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আবু উসামা বলেন:অর্থাৎ রাসূল তার সাথে রসিকতা করছিলেন।[১৮৩]

ঙ)আনাস রা. থেকে বর্ণিত

---

১৮২ আবু দাউদ : ২২১৪

১৮৩ তিরমিযী : ৩৫

أن رجلا استحمَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إني حاملك على ولد الناقة»، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟! فقال: «وهل تلد الإبل إلا النوق».

কোন এক ব্যক্তি রাসূলুলহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটি (ভারবাহী জন্তু) বাহন চাইলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমি তোমাকে একটি উটের বাচ্চার উপর চড়িয়ে দেব। সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কি করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: উটতো উটের বাচ্চা ছাড়া আর কিছু জন্ম দেয় না।[১৮৪]

(২) নিন্দাযোগ্য রসিকতা :

অর্থাৎ যে রসিকতা মন্দ উদ্দেশ্যে এবং অসৎ নিয়তে অথবা শরীয়তের নির্ধারিত রীতি ভঙ্গ করে সম্পাদন করা হয়। যেমন মিথ্যা মিশ্রিত রসিকতা, অথবা অন্যকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে কৃত রসিকতা।

(৩) বৈধ রসিকতা : ঐ রসিকতা যার কোনো সঠিক উদ্দেশ্য নেই, ভালো নিয়তও নেই, কিন্তু শরীয়তের নির্ধারিত গন্ডি থেকে বের

১৮৪ বুখারী: ১৯১৪

হতে হয় না এবং নিয়মও ভঙ্গ করা হয়না। পাশাপাশি অতিরিক্ত পরিমাণেও করে না যে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে । এমন রসিকতা প্রশংসাযোগ্যও নয় আবার নিন্দাযোগ্যও নয়। সুতরাং এর ভিতর কোনো পুণ্য নেই। কারণ পুন্য পাওয়ার যে নীতিমালা অর্থাৎ সঠিক উদ্দেশ্য এবং সৎ নিয়ত তা এখানে পাওয়া যায়নি অনুরূপভাবে কোনো গুনাহও হবেনা কারণ শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়নি বা কোনো নীতি ভাঙ্গা হয়নি।

রসিকতার কতিপয় নীতিমালা ও আদব :

প্রথমত : রসিকতা করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরত্ব দিতে হবে :

১। ভালো নিয়ত অর্থাৎ রসিকতা করার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে এমন ধারণা পোষন করবে যে সে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন এমন একটি ভালো কাজ করছে। যেমন রসিকতার মাধ্যমে নিজ ভাই, স্ত্রী, পিতা বা এমন কারো অন্তরে খুশি-আনন্দ প্রবেশ করিয়ে তাদের কর্ম চঞ্চল করে তোলা। অথবা উক্ত তামাশা করার মাধ্যমে কাউকে একটি ভালো কাজের নিকটবর্তী করে দেওয়া।অথবা নিজ আত্মাকে ভালকাজের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের লক্ষ্যে প্রফুল্ল করা বা

এরূপ যে কোনো ভালো নিয়ত পোষণ করা। আর এ মহান মূলনীতির প্রমাণ হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী,

«إنما الأعمال بالنيات».

“সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়তে উপর ভিত্তি করে নিরূপিত হয়।”

২। রসিকতা করার ক্ষেত্রে সত্যকে অত্যাবশ্যকীয় করে নেওয়া অর্থাৎ শুধুমাত্র সত্য ও বাস্তবধর্মী রসিকতা করবে এবং মিথ্যা পরিহার করবে। আবু হুরাইরা রা. বলেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله: إنك تداعبنا؟ قال «إني لا أقول إلا حقاً».

লোকেরা বলল: হে আল্লাহর রাসূল আপনি কি আমাদের সাথে রসিকতা করছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি সত্য ছাড়া বলি না।[১৮৫]

৩। রসিকতা করার ক্ষেত্রে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান বোধ থাকতে হবে, মানুষকে তার যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে এবং

১৮৫ তিরমিযী : ১৯১৩

প্রতিপক্ষের মন-মানষিকতা বুঝতে হবে। সকল মানুষ ঠাট্টা-রসিকতা পছন্দ করে না।

বলা হয়: ছোটদের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করো না তোমার মাথায় চড়বে এবং বয়স্কদের সাথে না সে তোমার প্রতি হিংসা করবে।

عن أنس- رضي الله عنه- مرفوعا: «ليس منا مَن لم يرحم صغيرنا، ويوقّر كبيرنا».

যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না সে আমার দলভুক্ত নয় ।

দ্বিতীয়ত: রসিকতার সময় যে সমস্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

১। মিথ্যা, ঠাট্টার ছলে হোক আর উদ্দেশ্য মূলক ভাবেই হোক মিথ্যা সর্বাবস্থায়ই হারাম এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে খুবই নিকৃষ্ট কাজ। মানুষকে হাসানোর জন্য যে মিথ্যা বলে তার প্রতি বিশেষ শাস্তির কথা এসেছে। আর এটা এই জন্য যে এটি খুবই বিপদজনক, সাথীদেরকে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি এর ভিতর খুব সহজেই জড়িয়ে পড়া যায় এবং এর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করা যায়।

«ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له».

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যে মানুষকে হাসানোর জন্য কথা বলে অতঃপর মিথ্যা বলে, তার ধ্বংস অনিবার্য, তার ধ্বংস অনিবার্য।[১৮৬]

শরীয়ত এ কু-অভ্যাসকে শুধু এখানে নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাট্টা-রসিকতার মত বিষয়েও এটি পরিত্যাগ করতে সকলকে দারুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বলেছেন:

«أنا زعيم... ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً»

আমি জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বিশেষ ঘরের জিম্মাদারী গ্রহনকরছি ঐ ব্যক্তির জন্যে যে সর্বোত ভাবে মিথ্যা পরিহার করেছে এমনকি রসিকতার মাঝেও।[১৮৭]

২। হাসি-রসিকতার ক্ষেত্রে বাড়া-বাড়ি এবং পরিমাণে এত অধিক করা যে মজলিসটিই হাসি-তামাশার মজলিসে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি চাপা পড়ে যায়।

---

১৮৬ তিরমিযী : ২২৩৭

১৮৭ আব দাউদ : ৪১৬৭।

আর এটি ব্যক্তির পরিচয় ও বৈশিষ্টে পরিণত হয়। এরূপ পর্যায়ের মজা-রসিকতা নিন্দনীয় ।কেননা এতে সময় নষ্ট হয়। ব্যক্তিত্বের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়, বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব শেষ হয়ে যায়, অবশ্যই ইহা মিথ্যায় পতিত করে। অন্যকে ছোট করা হয়, ছোটরা বড়দের উপর সাহসী হয়ে উঠে। অন্তর মরে যায় এবং মুসলিম যে ধরনের বাস্তব ও উপকারী গুণাগুণ দ্বারা অলংকৃত থাকার কথা তা তার থেকে দূরে সরে যায়।

৩। বেগানা নারীদের সাথে ঠাট্টা করা। কেননা এটা ফিতনা ও অশ্লীলতায় পড়ার কারণ এবং অন্তর হারামের দিকে ধাবিত করে।

৪। অন্যের ক্ষতি সাধন করা, কষ্ট দেওয়া বা অধিকার হরণ করা, অথবা এমন আঘাত করা যা সীমা লঙ্ঘন করে অথবা এমন জিনিস দ্বারা ঠাট্টা করা যার দ্বারা ক্ষতি হতে পারে যেমন পাথর বা অস্ত্র।

এ ধরনের ঠাট্টা হিংসা বিদ্বেষ তৈরি করে বরং কখনও ঝগড়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ঠাট্টাকে তখন আর ঠাট্টা মনে করা হয়না বাস্তব মনে করা হয় আর ভালোবাসা পরিবর্তিত হয়ে যায় হিংসায় । পছন্দ মোড় নেয় অপছন্দের দিকে ।

﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِىَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ يَنزَغُ بَيۡنَهُمۡۚ ﴾ [الاسراء: ٥٣]

অর্থাৎ : আমার বান্দাদেরকে বলে দিন তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মাঝে সংঘর্ষ বাধায়।

ينزغ শব্দের অর্থ প্ররোচনা, হাফেজ ইবনে কাসীর র. বলেন : আলহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন পরস্পরে কথা বলার সময় নরম এবং ভালো কথা বলবে। তারা যদি এমন না করে তাহলে শয়তান তাদের মাঝে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবে।

عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً، من أخذ عصا أخيه فليردها».

আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জিনিস-পত্র, মাল-সামানা খেলার ছলে হোক বা প্রকৃত অর্থে কোনো ভাবেই ধরবে না। যে ব্যক্তি নিজ মুসলিম ভাইয়ের লাঠি (এর মত নগন্য জিনিস ও) নিয়েছে তার উচিত ফেরত দেওয়া।

তাহলে যে ব্যক্তি টাকা পয়সা বা মূল্যবান ধন-সম্পদ না বলে নিয়ে নেয় তার অবস্থা কি হবে?।

৫। শরীয়তের বিষয়াদি নিয়ে রসিকতা করা, এসব বিষয়ে রসিকতা করা কে উপহাস ও বিদ্রুপ হিসাবে ধরা হয় যা মূলত: কুফরী এবং এগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন।

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

অর্থাৎ : তার যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর তবে তারা বলবে আমরাতো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন : তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তার হুকুম আহকামের সাথে এবং তার রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে, ছলনা করো না, তোমরা যে কাফের হয়ে গেছ, ঈমান প্রকাশ করার পর।

অনুরূপভাবে দ্বীনের ধারক বাহক তথা সাহাবা, উলামা, সালেহীন প্রমুখদের হুকুমও তাই। অর্থাৎ তাদের চাল চলন কথা বার্তা আচার আচরন ফতোয়া ইত্যাদি নিয়ে কেউ ঠাট্টা বিদ্রূপ করলে তারও ঈমান থাকবে না।